বীভৎসতা ও আমি

আনন্দ ভট্টাচার্য

শঙ্খ প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক, ১৩৬০

প্রকাশক :
অমিতাভ মজুমদার
শঙ্খ প্রকাশন
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীগোপাল ঘোষ
তাপসী প্রিণ্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

৬'০০

ধরা যাক, সমস্তটাই কাল্পনিক কিংবা কারো দেখা দুঃস্বপ্ন, যে দুঃস্বপ্ন কালের ইতিহাসে ঠাঁই পাবে কি না জানা নেই—কিন্তু সে দুঃস্বপ্ন তার ছিটেফোঁটা রেশও যেন না রাখে সচেতন মুহূর্তগুলোতে।

এই লেখকের ঃ

অনুবাদ—একটি খুন হবে (আগাথা ক্রিস্টি)

' বর্ণ ফ্রী (জয় এ্যাডামসন)

মৌলিক—কামনা নিশ্বাসে বিষ

অবলম্বনে রচিত—সিংহ যখন মানুষখেকো

সর্বনাশের নেশা

মেট্রোপলিটান সর্দারজী এমন বেমক্কা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে ভাবতে পারিনি। না ভাবাই কিন্তু অস্বাভাবিক ছিল। কেন না এট তো ট্রাবল্‌ড্‌ এরিয়া। এখানকার নাম শুনেই কতগুলো ট্যাক্সি যে চমকে উঠে পালিয়েছিল, মনে করতে পারছি না। কয়েকজন তো আমায় পাগল ঠাউরে বড়ো বড়ো চোখ বের করে ভাব দেখাল যেন নিতান্ত করুণার পাত্র মনে করেই চড়চাপড়টা থেকে রেহাই দিল। তবুও বলেছিলাম, ঠিক ঝঞ্ঝাটিয়া এলাকার বাইরে আমায় নামিয়ে দিলেই হবে।

যাইহোক, হলদে-সোয়ারী সর্দারজীকে এই সব বায়নাক্কার জন্যে বেশি অবকাশ দিই নি। ঠিক সেই সময়েই যেন সাম ওয়েনের কথা কটা মনের পর্দায় চড়া সুর তুলে ফেলেছিল—ক্যান স্পেণ্ড এনি এ্যামাউন্ট! নেহাৎ অনভ্যস্তভাবেই কেমন বেপরোয়া ঝোঁকের বশে সর্দারজীর হাতে খান-পাঁচেক দশ টাকার নোট গুঁজে দিতে যাচ্ছিলাম। হলদে গাড়ীর মধ্যে সাদা দাড়ির সৌম্য মুখখানায় বোধহয় দেখেছিলাম এক ধরনের সহনশীল উদারতা! আর সেই ভরসাতেই সম্ভবতঃ···

ভাঁজের মধ্যে থেকে নোট ক'খানার একটা আন্দাজ নিয়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল সর্দারজী, ঠিক কোনখানে যেতে হবে? এলাকার নাম বললাম আর আন্দাজ দিলাম ঠিক কোনখান থেকে বেঁকতে হবে। নোট ক'খানা যথাস্থানে রেখে হাত তুলে আমাকে চুপ করতে বলল

সে, আর এক হাত সস্নেহে রাখল স্টিয়ারিং-এর ওপর। দরজা খুলে বসতেই আপনমনে নির্দেশ দিল চুপচাপ বসে থাকতে।

তারপর মেট্রোপলিটান উড়ে চলেছিল এ্যাপেলো কিংবা সয়ুজ-এর মত, ট্রাফিকের অত ভিড়, তারই মধ্যে দিয়ে কী বেপরোয়া ছুট! অবাক হলাম, বিনা দুর্ঘটনায় নর্মাল এরিয়ার পীক-আওয়ার জ্যাম কাটিয়ে নরনারীর ত্রস্ত-ব্যস্তসমস্ত রাস্তার খেয়া পারাপার একটুও আহত না করে মেট্রোপলিটান কতটুকু সময়ের মধ্যে ক্রমবিরল ফাঁকা রাস্তায় উড়ে চলেছিল তাই অনুভব করে। কমতে কমতে ক্রমেই শূন্যের কোঠায় পৌছে যাচ্ছে ট্র্যাফিকের আনাগোনা, জনতার সঞ্চরণ। এখন রাস্তা যেমনি চওড়া তেমনি সুগম, অবশ্যই দৃশ্যতঃ। হাত আরও খুলে গেছিল মহান সর্দারজীর।

যতই গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছি ততই দুরন্ত গতিতে সুপ্ত উত্তেজনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কারণ, প্রথমতঃ গাড়ীর গতি; দ্বিতীয়তঃ একটা নামী এলাকায় দামী কাজেব কাছাকাছি হচ্ছি। সেই এলাকার উল্লেখ নাই বা করলাম। এটুকু জানলেই হবে, সে নামে কারো জাগে ত্রাস, কারো শিহরণ। অনেক কাহিনী লোকেব মুখে মুখে আজও ফেরে কিংবা স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলি কিছু কিছু ঘটনায় দূরের লোকদের পবিচয় করিয়েছে সেখানকার। মাত্র কয়েকমাস কিংবা দু-এক বছরের ব্যবধানে এমন অনেক ঘটনা কিম্বদন্তী বা উপকথার মতই হয়ে গেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখে পড়ল, রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছে। জন-মানবের দেখা নেই। এমনকি গৃহহারা পথপ্রান্ত প্রবাসীদের খুপরী-গুলোও শূন্য। বন্ধ দোকানপাট। চারদিকে হরতালের নিষ্প্রাণতা কিন্তু রাস্তায় চিরাচরিত খেলুড়ের দল অনুপস্থিত। থমথমে বাতাসে এক ধরনের অব্যক্ত ভয়াবহতা।

কোথায় যেন ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। জেগে-ওঠা উত্তেজনা নিমিষে দেখা দিল আতঙ্ক হয়ে। এর আগেও তো

অন্যভাবে অন্যান্য ট্রাবলড্ এরিয়ায় গেছি, একবারও তো এমনটা হয় নি।

যে গলি দিয়ে ঢুকতে হবে, সামনে দেখতে পাচ্ছি তার মোড়টা। প্রায়ই এখান দিয়ে গিয়েছি। গলির মুখটা ছাড়িয়ে মাত্র কয়েক হাত পরের বাস-স্টপে নেমেছি তার আগে। অতি পরিচিতের মতই এখানকার মানুষেরা আমাকে দেখেও দেখেনি, কোন কথা কোনদিন জিজ্ঞাসা করেনি কেউ—কোথা থেকে আসছি, যাব কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক একইভাবে এই গলির মধ্যে ঢুকে কয়েকটা বাঁক পেরিয়ে বারবার পৌঁছেছি এর আগে সেই বাড়ীটার সামনে যেখানে এখন চলেছি। কিন্তু আজ? এই চত্বরে স্বল্প পরিসরের অতি-পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে যাওয়াই আমার কাছে সমস্যা। অন্য কোন রাস্তাও আমার জানা নেই কারণ তার দরকার হয় নি আর বাঁধা-ধরা সোজা-সরল এই সিধে ছবির মত পথটুকুই এখন না জানি কত বা দুস্তর।

মোড়টায় মেট্রোপলিটান এসে পৌঁছবার আগেই আপনা থেকে অস্ফুট নির্দেশ দিয়েছিলাম সর্দারজীকে, বাঁয়ে—

বলতে না বলতেই সামনের দিকে সীটের হেলান-দেওয়া জায়গাটার পেছনে কেউ যেন আছড়ে ফেলে দিল আমায় একেবারে আচমকা। বাঁদিকে ঘুরবে গাড়ীটা, হয়ত তাই এই বিপর্যয়। সামনে উঠে দেখতে গেলাম, বাঁয়ে ঘোরার কত পরে একেবারে 'রোক্‌কে' বলতে হবে তা দেখাব জন্যে।

কিন্তু না! ডেড্-স্টপ হতে না হতেই রোমশ বলিষ্ঠ একখানা হাত পেছনের দরজা খুলে আমাকে রাস্তায় ঠেলে ছুঁড়ে ফেলে দিল; যেন জুডোর কোন অব্যর্থ প্যাঁচে।

গড়াগড়ি খেতাম। কিন্তু কোনমতে কসরৎ করে উঠে দাঁড়ালাম। মুখ খোলার বিন্দুমাত্রও সুযোগ আমাকে না দিয়ে একটা পাক্ খেয়ে হাওয়া হল মেট্রোপলিটান। মিলিয়ে-যাওয়া হলদে রঙটা সর্ষে ফুলের

রূপ নিল। এবার একা এই জনশূন্য থম্‌থমে রাস্তার মাঝে বিখ্যাত ট্রাবল্‌ড্‌ এরিয়ায় কী করি! অভীষ্ট লক্ষ্যের কাছাকাছি। মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান, কিন্তু এ ব্যবধান ঘোচাব কী করে?

ফিরে দেখার আগেই নাকে এল পোড়া গন্ধ। গলির মধ্যে থেকেই আসছে, সম্ভবত একটু ভেতরের অগ্নিকাণ্ড। চোখ মেলে দিলাম ভেতরে। তেমন কিছু চোখে পড়ল না। একপাশে কোন কারখানা বা গুদোমেব দেয়াল আর একপাশে কয়েকটা করোগেটের টিন আর টালি খোলার চালের পাতলা ইটের হাল্কা গাঁথুনির দোকান ঘর— এখন বন্ধ। তারপরে তুপাশে বসতবাটী, নানা তলার, বিভিন্ন আয়ুর। ধোঁয়া উঠছে আরো দূর থেকে।

ত্রিসীমানায় দেখা যায় না কাউকে। স্পষ্টই বোঝা যায় অবশ্য, এতটুকু রাস্তাও দূর অস্ত্‌। ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে কি এগিয়েই যাব গলির ভেতরে যেখানে স্পষ্টতই অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে আর কী হচ্ছে জানি না।

অন্য কোন পথ ভাবতে পারলাম না। শোনা কথা, এখানে এমন অবস্থা চলছে তেমন জেনেই এসেছি। দায়িত্ব নিয়েছি কাজেব,— এখন দ্বিতীয় পথ নেই।

অতএব গলির দিকে পা বাড়ালাম নিরুপায় হয়েই। দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। ছোট হাতব্যাগটা একহাতে চেপে ধরে এগোলাম। সচেতনভাবেই বুঝছি, কোন অনিবার্য আকর্ষণই টেনে নিয়ে চলছে আমাকে, নইলে অন্য কোন পথ নেই কেন আমার সামনে?

সবে তু-চার পা গেছি কি না গেছি, পরের পর কয়েকটা শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল। ঘরগুলোর করোগেটের ছাউনি ঝনঝনিয়ে উঠল, খোলার চালগুলো বাজল অদ্ভুত একতানে।

তাহলে এ্যাকশান চলছে? হ্যাঁ, গলির ভেতরেই চলছে!

চলুক, তবু যেতে আমাকে হবেই। মনের চোখে নানারকম পরিস্থিতি দেখতে দেখতে কদম বাড়াচ্ছি। যে কোন মুহূর্তে একটি

যে কোন আকৃতির ব্রহ্মাস্ত্র আপন করে নিতে পারে আমাকে। বোমা, ক্র্যাকার, পাইপগানের গুলি বা রিভলবার-শট্ সাময়িক বা বরাবরের জন্যে আমার গতি রুদ্ধ করে দিতে পারে। এই জনহীন গলির বসতি-বহুল কেন্দ্রে ইঁট-বেরিয়ে-পড়া ছড়ানো ছড়ানো পাতলা পীচ আর মিনি-চিপসের আস্তরণের ওপর রক্তাক্ত হয়ে পড়তে পারি আমি। অথবা কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের মুখোমুখি পড়ে সেই একইরকম পরিণতি বরণ করতেও বাধ্য হতে পারি।

নানা রকম ভেবে মনটা শক্ত করার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণের মত যে আতঙ্ক বুক জুড়ে বসেছিল তা মুছে ফেলতে চাইলাম। এমনও তো হতে পারে, এ সবই অবলীলায় পার হয়ে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছব। শুধুমাত্র খারাপটাই বা ভাবছি কেন ?

কিন্তু সামনেই গলির বাঁক পার হয়ে যাদের দেখছি, সেই দলটার মুখোমুখি আমার কর্তব্য কী ? সংখ্যায় ওরা জনা-ছয়েক। পরিচয় তাদের চেহারাতেই মালুম। সবাই সশস্ত্র। খোলা তরোয়াল, ভোঁজালি, পাইপগান, বন্দুক কারো না কারো কাছে। বোধহয় রাউণ্ড দিচ্ছে, কিংবা— ?

চ্যালেঞ্জ করে বসল ওরা, আমাকেই। দাঁড়ান।

কোন দল, কী পরিচয় দিই ? দাঁড়ালাম। এতগুলো কল্পনা আশঙ্কার অন্ততঃ এক চিলতে সত্যি হয়ে দেখা দিল। ঠিক খেয়াল হচ্ছে না, কাঁপছিলাম না অসাড় হয়ে গেছিলাম।

ব্যাগে কী ? জানতে চাইল একজন।

আমার সব কাগজপত্র। স্পষ্টতই বুঝলাম, গলা শুকিয়ে গেছে। কেমন করে শব্দগুলো পথ পেয়েছিল কে জানে ?

দেখি। একটা কঠোর হাত এগিয়ে এল। তার দুটো কর্কশ আঙুল নাচতে দেখছি নাকের ডগায়। কিন্তু আলগা করি নি। প্রাণপণে ধরে আছি ব্যাগটা।

যাচ্ছেন কোথায় ? পেছন থেকে সামনে এগিয়ে এল একজন।

চট্‌পট্‌ বলে ফেল চাঁছু, 'বডি' পড়ে যাবে। শাসাল আর একজন।

সত্যিসত্যিই যার বাড়ীতে যাচ্ছি তার নাম বললাম।

কে হয় আপনার? পেছন থেকে যে এগিয়ে এসেছিল, জিজ্ঞাসা করল সে।

আত্মীয়। ভাই হয় সম্পর্কে।

আসছেন কোত্থেকে?

গল্প বললাম। বাইরে থাকি, পশ্চিমা মুলুকে। মাত্র আজ সকালে শহরে এসে পৌঁছেছি। উঠেছি রাজ হোটেলে। আজ রাতেই ফিরব। কাজেই দেখা করতে আসছি, জরুরী ঘরোয়া দরকারে।

কীসে এলেন? বাস-ফাস তো বন্ধ!

মোটা কথার আঁচড়ে বললাম ট্যাক্সির বৃত্তান্ত।

সত্যি তো? না অন্য কোন কিচাঙ্গিন আছে?

আমার কথা বিশ্বাস করতে পাবেন। না হয় কেউ চলুন আমার সঙ্গে।

সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে দেখল ওরা। তারপরে ওদের একজন বলল, যান। নেহাৎ ফন্টাদার লোক তাই বেঁচে গেলেন।

আমাকে পাশ কাটিয়েই এগিয়ে চলল দলটা। সুযোগ ছাড়তে মন চাইল না। ভয় আতঙ্ক কাটিয়ে চট করে বের করে ফেললাম সাম্ ওয়েন-এর দেওয়া কী-হোল্ডার আকৃতির মাইক্রো-ক্যামেরাটা। রাস্তার একপাশে সরে এসে সমস্ত দলটার একটা প্রোফাইল নিলাম পেছন থেকে।

কী ভাগ্যি! নজর দিল না ওরা এদিকে। আর এক মুহূর্তও দাঁড়াবার মানে হয় না। গন্তব্য বাড়ীটার দিকেই এগোলাম। খানিক গিয়ে পেছনে একটা জোর আওয়াজ শুনে পিছু ফিরলাম।

কিন্তু দেখব কেমন করে? বাঁক পার হয়ে চলে এসেছি। সামনেই এগিয়ে চলা ছাড়া এ অবস্থায় গতি নেই। অগত্যা কৌতূহল চেপে রেখে চললাম। অনিবার্যভাবেই কিন্তু নজরটা পড়ে গেল

একটা ফাঁকা মাঠ কিংবা বাগানের ফোকর দিয়ে বাঁকের ওপারে ফেলে আসা গলির রাস্তায়। প্রত্যাশিত দৃশ্যটা চোখে এল।

একটা বাড়ীর দরজায় ধাক্কাধাক্কি স্থুরু করেছে দলটা। তার সঙ্গে খিস্তির বান ডাকিয়ে দিচ্ছে। কোন একজনকে উদ্দেশ্য করে তার চোদ্দ পুরুষের কাউকে কাঁচা খিস্তির স্রোত থেকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে না।

ঝাঁপ্ খোল্। নইলে সবক'টাকে ফুটিয়ে দোব। দলের লোকগুলো হাঁক দিচ্ছে, হেঁকোড়বাজা করলে শা—লালঘোড়া ছুটিয়ে দোব।

পরেরগুলো না লেখাই ভালো। ভাষা বাছা বাছা। ষোল আনা মনে রাখতে পারি নি। আর যেটুকুও বা মনে পড়ছে লিখতে কলম সরে না।

স্তম্ভিত হবার দিন নেই বোধ করি। শুধু ভাবি, এই মুহূর্তে যদি জঙ্গল থেকে এক পাল হিংস্র শ্বাপদ ছুনিয়ার সব থেকে বেশি ঘন বসতির মাঝে এসে পড়ে জীবধর্ম পালনের কাজে আত্মনিয়োগ করে তাতে কোন অস্বাভাবিকতা থাকবে না। অলক্ষ্যে সেই আদিম প্রথা নির্বিবাদে নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে, মানুষের সমাজে। আর সেই সমাজের সবাই ঠিক করে নিয়েছে, এই প্রথাই বলবৎ হবে।

দেখলাম, ধাক্কাধাক্কিতে দরজা খুলে গেল। না খুললেও অবশ্যই ভেঙে যেত খানিক পরে। এক প্রৌঢ় অবয়বকে দেখলাম ছিটকে পড়তে গলির রাস্তায়। টেনে হিঁচড়ে তাকে ফেলে দেওয়া হল। তারপরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল দলটা। অবিলম্বেই কয়েকটা আর্তনাদ—নারীদের, শিশুদের কান্না আর অশ্রাব্য খিস্তি শুনতে পেলাম।

সে শা···বাচ্ছা সেঁধিয়েছে কোথায়? কোন একজনের গলা শোনা গেল।

জবাবে কান্নাজড়ানো ভীত চকিত আর্তস্বর কানে এল। স্পষ্ট বুঝলাম না। কিছুক্ষণ দুমদাম, ধুপধাপ আওয়াজ, চীৎকার, হুংকার

পরের পর শোনা যেতে লাগল। একটু পরেই বীভৎস উল্লাসে সরব হল একটা গলা।

এই যে বাছাধন পায়খানার ভেতর ঢুকেছে। বেরিয়ে আয় শা-- উদবেড়ালের ছানা!

দরজায় ধাক্কা দেওয়ার ভোঁতা আওয়াজ ডুবে গেল আচমকা কতকগুলো বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায়।

এতক্ষণে খেয়াল হল, এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বিপজ্জনক। অন্য কোন দল বা অভিযাত্রী কারো চোখে পড়িতে পারি। হাতের মাইক্রো-ক্যামেরাটা তাদের নজরে পড়ে যেতে পারে, যতই ছোট হোক। তখন পরিত্রাণ না মেলাই স্বাভাবিক। যত জোরে পারি হাঁটতে লাগলাম এবার।

চারদিকে নানারকম আওয়াজ উঠছে। কখনো বোমা ফাটছে, কিংবা পাইপ গান শট হচ্ছে, রিভলবার সশব্দ হচ্ছে, বাড়ী-ঘর-দোর-জানলা প্রভৃতি প্রতিবাদে সরব হচ্ছে। আর্তনাদ, কান্না, চীৎকার, উল্লসিত হল্লা কখনো-সখনো ছড়িয়ে ছড়িয়ে আওয়াজ তুলছে।

একি! হঠাৎ চোখে পড়ল গলির রাস্তার পাশেই পড়ে আছে একটা বিচ্ছিন্ন নরমুণ্ড। সামান্য তফাতে একখানা কাটা হাত।

আর এক সেকেণ্ডও অপেক্ষা করার মানে হয় না। যদি মাটি না ছুঁয়ে, রক্তাক্ত মাটির স্পর্শ এড়িয়ে চলা যেত! কিন্তু মনে হচ্ছে, জিভটা কেউ টেনে নিচ্ছে গলার মধ্যে। রক্তের ছাপ, ক্ষীণ ধারা ডিঙ্গিয়ে পাশ কাটিয়ে চলেছি।

চলেছি যেন নিশি-পাওয়া কোন বেহেড লোকের মত। ছেচল্লিশের আগস্টের সেই রক্তাক্ত দিনগুলো, যখন সবে এই বৃত্তি নিয়ে নেমেছি রাস্তায়, ঘুরেছি পাড়ার পর পাড়া, এলাকার পর এলাকা তখন কি এখনকার বিচিত্র অনুভূতির শিকার হয়েছিলাম? কী জানি, একটুও মনে পড়ে না। শুধু ভাবছি, ছিন্ন মুণ্ড আর কবন্ধের এই

বাসভূমিতে এক অদ্ভুত অভাবিত যোগাযোগে আসার কোন উপলক্ষ এর আগে আমায় কখনো গ্রাস করেছিল কিনা!

ভুলে গেলাম কোন দলের সামনে পড়ব কি পড়ব না সেই ভয়। হঠাৎ জীবনের ওপর এল এক ধরনের দুঃসহ ঘৃণা। কেমন বমি-বমি পেতে লাগল। কেন কে জানে? এই যে মহামারণোৎসবের সগৌরব স্বাক্ষর এই অখ্যাত গলির হৃদপিণ্ডের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে, ঐ যে দানবীয় উল্লাস চারপাশ থেকে ভাসিয়ে দিচ্ছে আর্ত চিৎকার, কত পোড়া বাসগৃহের ধোঁয়ায় জ্বালা করছে চোখ—এ সবই তো জীবনের ওপর আক্রোশের নমুনা তুলে ধরছে সামনে। যদি নাই থাকে সে জীবন, ক্ষতি কি?

পরক্ষণেই বুঝলাম, তা হয় না। এখুনি আমি একলা জীবনের মায়া ছাড়তে পারি। মুখোমুখি নির্বোধ জুয়ার দান ধরে বোঝাপড়া করতে পারি। তবে একেবারে সুনিশ্চিত খরচের খাতায় জীবনটাকে লিখে বসতে হবে সে খেলায়। বীরত্ব?

কিন্তু লাভ কি?

মৃত্যু নিশ্চিত জেনে চরম লড়াই করতে লোকে যে-কালে নামত, তার নাম মধ্যযুগ। শিশু, নারী, বৃদ্ধ অসহায়ের প্রাণরক্ষার ব্রত নিয়ে বীরত্বের টীকা পরত। এ যুগের মানুষের কাণ্ডজ্ঞানবিবেচনা সেই যুগের কথা পড়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসে, বলে—ইডিয়টস্। আপনি বাঁচলে বাপের নাম—এই সার কথার জ্ঞান হয় না যাদের তারাই মূঢ়। অতএব মধ্যযুগ সেই কবে পার হয়ে এসেছি। সুতরাং আমি কে? —ক্ষুদ্র জীব, কীটাণুকীট—ডেনমার্কের যুবরাজের মত অধর্মের পৃথিবীকে স্বধর্মে আনতে তথাকথিত কোন মহৎ কর্তব্যের দায়ভাগ কাঁধে নেব কেন? পৃথিবীর অত্যাচার, মনুষ্যত্বের বিচ্যুতির প্রতিকার করতে তো আমার জন্ম হয় নি।

পাগলের মত এমন সব বিশ্রস্ত চিন্তায় জোরে হাঁটা ভুলে যাই নি। মনে পড়ছে, এমন সব দৃশ্য হতে পারে আমার বাণিজ্যের পণ্য।

সুতরাং ত্রস্ত পায়ে নিজের বিপদ পাশ কাটিয়ে পথ হাঁটছি। স্থান-বিশেষে মাইক্রো-ক্যামেরাটাও কাজে লাগাচ্ছি। আবার মনে মনে কল্পনা করছি বীরত্বের। হাসি পেল, অনুকম্পা হল নিজের ওপর, এমন আকস্মিক অসংলগ্নতার জন্য।

মিরাক্‌ল! এসে গেছি গন্তব্যস্থল সেই বাড়ীটার সামনে। প্রাণপণে চেপে ধরেছি কলিং বেল। কোন শব্দ নেই, সাড়া নেই। দরজায় নক-ও করছি।

কে? গলা শোনা গেল একটা, ওপর থেকে। রুক্ষ হলেও পরিচিত।

আমি—, গলা চিরে প্রাণপণে আওয়াজ তোলার চেষ্টা করলাম।

ওপরের ছোট্ট বারান্দা থেকে একটা মাথা ঝুঁকে পড়ল।

আরে! থাম্, থাম্—খুলে দিচ্ছি।

চেনা লোকটার চেহারা দেখে আর গলা শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মুরারি তাহলে বাড়ীতেই আছে। যদি না থাকত? কল্পনা করে শিউরে উঠলাম একটু। বুঝলাম, স্বাভাবিক হয়ে এসেছি। এতক্ষণ বুঝি কোন ব্যবহারিক অনুভূতি ছিল না আমার। কেউ খুন করে লাশ মাড়িয়ে চলে গেলেও টের পেতাম না বোধহয়।

তোর কী কাণ্ড বল্ তো? আয়, আয়।

আমাকে একরকম জোর করে ভেতরে টেনে নিয়েই দরজা আর কোলাপসিবল্ গেট আবার বন্ধ করে তালা দিল মুরারি।

এলি কেমন করে? কী কাণ্ডকারখানা তোর? চোখ বড় বড় করে কৈফিয়ৎ চাইল ও।

আগে বসি চল্। তারপরে সব বলছি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আর কোন কথা বলল না ও। আসল কথাটা কায়দা করে পাড়তে হবে ওর কাছে। ও-ই এখন আমার আশা-ভরসা।

বোস্। দোতলার ঘরটাতে আমাকে বসিয়ে চা না কফি খাব জেনে চলে গেল মুরারি। সম্ভবতঃ ফরমায়েস দিতে।

ঘরটার চারদিক দেখতে দেখতে মনে পড়ল—এইখানে কতদিন বসেছি ওর সঙ্গে। গল্প করেছি, ফ্লাশ খেলেছি, বীয়ার খেয়েছি; তর্কাতর্কি, ঝগড়াঝাঁটি, কথা বন্ধ আবার ভাব—ইত্যাদির অলক্ষ্যে সময় সময় ছেলেমানুষি করার জন্য, জুয়া খেলার কারণে কিংবা মদ খাওয়ার নেশা ধরার বাবদ আর একজনের বিস্তর তিরস্কার মিষ্টি ঝঙ্কার হয়ে কখনো-কখনো কানে বেজেছে। তার স্মৃতি এখানকার চার দেওয়ালে আটকে আছে। সে-সবের সঙ্গে আজ এখানে এসে পড়ার কত না তফাৎ!

বাড়ীটা কেমন যেন থম্‌থম্ করছে। ছেলেমেয়ে তুটো'র হুটোপুটি নেই, সেই গলাটাও শোনা যায় না, যা নিয়ত শোনার জন্যে একদা মুরারি হাতে সুদর্শনের মত ধরেছিল একখানা বাঁকানো ছোরা।

সে কথা এখন থাক। আপাতত হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পারছি নিশ্চিন্তে। যে-সব দৃশ্য স্বল্পকালের জন্যে হলেও দেখে বা দেখতে দেখতে দুস্তর রাস্তাটুকু পার হলাম তার ছিটেফোঁটাও এই চৌহদ্দির মধ্যে চোখে পড়বে না। সুতরাং এখানে আসার কারণে অবিভাজ্য হৃদ্‌পিণ্ডের মত প্রয়োজনীয় হাতব্যাগটা পাশেই রাখলাম, সোফার ওপর।

কাজ সারতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সেজন্যে একমাত্র মুরারির সাহায্যই চাইতে পারি আমি, আর কারোর নয়। সাহায্য মানে, ও ছাড়া কোন কাজই হবে না আমার। সেই উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি।

অতএব মুরারি আসুক, তারপরে কথা।

কোন কাজে এসেছি, যেন নতুন করে মনে পড়ল। আর তাই ভাবতে ভাবতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এক সময় মনে হয়েছিল দুর্গম বলে কথাটা এইকালে শুধুমাত্র পাহাড় পর্বত কিংবা নদী-নালা

'পারের দেশে যাওয়ার প্রসঙ্গে অচল হয়ে পড়ছে। সুন্দর না হলেও যাতায়াত করা যায়, কিংবা ট্রাম বাস চলে, অন্য ধরণের গাড়ীঘোড়া বহাল তবিয়তে চলাচল করতে পারে এমন রাস্তাকেও দুর্গম বলা চলতে পারে এবং চলেও—খুব সঙ্গত কারণেই।

আচ্ছা, ফোন করা যাবে? নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করে মিউজ করলাম একটু। লাইন-ফাইন রাস্তা খুঁড়ে কাটতিস করা অস্বাভাবিক নয়। তাহলে না হয় মিঃ সামকে ওর লী রোডের এ্যাপার্টমেন্টে একটা মেসেজ দেওয়া যেত—ঘটনাস্থলে এসে গেছি, কাজ এগোচ্ছে, আশা করি—

পরমুহূর্তেই ভাবনা হল, পারবে কি মুরারি সাহায্য করতে? যদি সমস্ত ব্যাপারটা ওর নাগালের বাইরে হয়? যদি বাইরে না বেরোতে পারে ও? আসল ঘটনাস্থলগুলো যদি আমায় সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে না পারে? জানি, দারুণ ইনফ্লুয়েন্স ওর। এ এলাকার সব মাস্তানের সঙ্গেই ওর রীতিমত দহরম-মহরম। ও কি আমাকে সঙ্গে নিয়ে—

ফিরে এল মুরারি। এসেই বিনা ভূমিকায় বলল:

কী ব্যাপার বল তো? এমন অবস্থায় এসে হাজির হলি কেন?

বলছি, একটু দম নিতে দে'।

বেশ, নিয়ে নে যত পাবিস্। তা পথে কোন ঝামেলা বা আপদবিপদ হয় নি তো? অবিশ্যি ঠিক এই গলিটায় তেমন ইয়ে না থাকারই কথা। তাই বলে কেটে পড়তে চাস্ না যেন। সিচুয়েশান খুব খারাপ। আওয়াজ শুনছিস্ তো?

জবাব না দিয়ে মাথা নাড়লাম। জের ধরে আবার বলে চলল ও, আর যাবিই বা কী করে? নো কম্যুনিকেশান। এলি কী করে?

বলতে হল, মেট্রোপলিটান ইতিবৃত্ত।

অমন করে এলি, তা নিশ্চয়ই তেমন কিছু দরকার?

দরকার জরুরী, খুব জরুরী।

যতই জরুরী হোক। এখন আসা ইম্‌পসিবল্‌। তা তোর লাক্‌ আছে বলতে হবে।

তা আছে। তবে গুড না ব্যাড বুঝতে পারি নি এখনো। নেমেই যা দেখলাম!

কী দেখলি?

বললাম পথের কাহিনী। শুনে মন্তব্য করল ও:

তোরাই মাইরি পারবি। শা—খবরের কাগজের ব্যবসাদারী করিস্‌, তার জন্যে জান খোয়াতেও পেছপা ন'স।

যা ঘটল, মনে হচ্ছে সবটাই মিরাক্‌ল্‌ বুঝলি, মুরারি। মেট্রোপলিটান সর্দারজী শেষটায় যাই করুক না কেন, প্রথম চোটে এক কথাতেই কলের চিড়ে'র মত নরম হয়ে যাবে, তারপর এই নিধনযজ্ঞের মাঝে এসে তোর নামের মহিমায় পার পেয়ে অক্ষত অবস্থায় তোরই নিরাপদ আশ্রয়ে উঠলাম। সমস্তটাই ভাবা যায় না, এমন।

কেন যাবে না? এবার বল্‌ দেখি কী ব্যাপার?

বন্ধুর কাছেও প্রাণ খুলে সত্যি কথাটা বলা যায় না, এজন্যে বিবেকের খোঁচা একটুও বিঁধল না আমায়। বরং কফি এসে যাওয়ায় মিথ্যে বলার এন্‌থু পেয়ে গেলাম। কাপে চুমুক দিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়ে, ওরা কেউ নেই, তপতী?

না নেই। চালান করে দিয়েছি বাপের বাড়ী। এসবের মধ্যে রাখে ওদের? নার্ভাস ব্রেকডাউন হতে পারে। তার ওপর বাড়ীর ওপর কখন কী হয়।

হতে পারে নাকি কিছু?

আর কিছু না হোক, উৎপাত হতে পারে তো?

উৎপাত?

হ্যাঁ। তাদের কাছে আদিখ্যেতা আমাদের কাছে উৎপাত বুঝবি না তুই। দিন-কাল যা পড়েছে, কত দিক সামলে চলতে হয়

'জানিস্? কাউকে না চটিয়ে, সবায়ের মন জুগিয়ে, সকলকে জানতে দিয়ে যে ভেতরে ভেতরে বাপু তোমাদের দলেই আছি।

সে আবার কেমন কথা?

ঠিক কথা। শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে উপদেশ দেবাব ভঙ্গিতে হাতের চেটো'র একটা বিশেষ মুদ্রা করে বলল ও, আছে বৎস, আছে। শুধু খবরই বেচতে শিখেছিস। প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থাকলে বুঝতিস্। ধর্, কোনটা কার এরিয়া জানতে হয়। সব পার্টিতেই মালকড়ি ছাড়তে হয় আর চাঁদার রসিদ সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হয়। দরকার মত ঠিক ঠিক রসিদ বের করতে হয়।

বুঝেও না বোঝার ভান করলাম। আসল কাজের কথা পাড়ার দরকার

আচ্ছা। এবারে যে কাজের জন্যে এসেছি, শোন।

বল্। শা—আসল কথাটাই বাদ পড়ে যাচ্ছে।

তোদের এই এরিয়ায় একটা ছেলেকে খুঁজতে এসেছি। তোর হেল্প চাই।

ছেলে হারিয়েছে? কত বড়?

হারায় নি। বৌদির এক ভাই, তাকে দেখিস্ নি তুই? অন্য জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে ক'দিন আগে তোদের পাশে ঐ যে বটতলা-কলুপাড়া আছে, সেখানে ক'দিন আগে শেল্টার নিয়েছিল। তাকে খুঁজব।

তবেই হয়েছে! বরং খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজে পাবি কিন্তু সত্যি. যদি সে ছেলেটা এসে থাকে, খুঁজে পাবি না।

তাহলে আর তোর কাছে এলাম কেন, বল?

কেন? আমি কি এখানকার কিং?

তোর ইনফ্লুয়েন্স আছে। দেখ্ না, যদি একটু ঘোরাতে পারিস্ আমাকে ঐ এরিয়ায়!

নাম-টাম জানিস্? দেখলে চিনবি তো?

মোটামুটি চিনব। নামও জানি।

ঠিক কোথায় এসে ঘাঁটি নিয়েছিল জানিস্ তো ?

শুনেছি কলুপাড়া বা বটতলায়। ঐ দুটোই তো ইয়ে—পকেট ?

"হ্যাঁ, ছিল ক'দিন আগে অন্ততঃ পরশু অবধি। আজ কী অবস্থা জানি না।

যাওয়া যায় না ওখানে ?

অসম্ভব। যতক্ষণ না অবস্থা নর্মাল হয় ততক্ষণ।

খুব দূরে ?

না, এই তো পাশাপাশি। আমাদের তিনতলা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

তাহলে একটু চেষ্টা কর্ না ভাই। যদি খুঁজে পেতে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে আনা যায়। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল্, চট করে ঘুরে আসি।

এক্ষুণি যাবি নাকি ?

তবে কি ? যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়।

তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে

কেন ?

কেন ? কে যাবে এখন ওখানে ? প্রাণের মায়া তুমি না করতে পার আমার করতে হয়।

কেমন বিপদ মাথায় নিয়ে এসেছি শুনলি তো ? ভায়ের জন্যে বৌদি'র মাথা খারাপ হয়ে গেছে প্রায়। একেবারে বাচ্চা ছেলে। হায়ার সেকেণ্ডারী দেবার কথা এবারে। কোত্থেকে যে কী হয়ে গেল !

বুঝতে পারছি। কিন্তু কী করব বল্? এখন ওখানে গেলে প্রথমতঃ ঢুকতে পারব না। আর যদিও বা ঢুকি, বিপদ-আপদ হবেই। দ্বিতীয়তঃ তা যদি নাও হয়, ছেলেটাকে সন্ধান করা যাবে না এই অবস্থায়। আর গেলেও বাঁচানো যাবে না।

কেন, এখানকার দলবল তো সবই তোর জানা শোনা। তোর ওপরেও ঝামেলা করবে?

এপাড়া ওপাড়ার ছেলেরা তো আর এসব করছে না। সবই বাইরের। তারা কেউ চেনে না আমায়। কাজেই রেয়াৎ করবে না।

কিন্তু পথে যে দলটার পাল্লায় পড়েছিলাম তার মধ্যে একটা ছেলে তোর নাম বলতেই রেহাই দিল আমাকে।

ও হয়ত পথঘাট চেনাতে এক-আধজন এক এক দলে আছে। তোর ভাগ্য ভাল অমন একটা দলের পাল্লায় পড়েছিলি। নইলে কী হত বলা যায় না। খামোখা চোট করে বসতে পারত।

যাইহোক, কিছু একটা কর, দোহাই তোর। নইলে বাড়ী ফিরে মুখ দেখাতে পারব না। অন্ততঃ চেষ্টা করেছি যেন এমন বলতে পারি।

মিনতির সুরটুকু বোধহয় ওর অন্তর ছুঁয়ে গেল। চোখাচোখি চাইল ও। উদ্বেগ কতখানি আন্তরিক-হয়তো তা বোঝার চেষ্টা করল। যতটা সম্ভব উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা চোখেমুখে ফুটিয়ে তুললাম। নির্জলা মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেবার প্রেরণা আসল সত্যের তাগিদের থেকেও বোধহয় অনেক বেশি। কিংবা প্রতারণার কৌশল ভারী নিখুঁত হয়ে যায় কোন কোন ক্ষেত্রে।

উপায় ছিল না যে। এখানে আসার আসল উদ্দেশ্যটা বললে এক কথায় উড়িয়ে দিত ও। সঙ্গে কিছু গালাগালি বোনাস দিত। বলত ও, শা—ব্যাপারী! মানুষের লাইফ এণ্ড ডেথ কোয়েশ্চেন আর তাই নিয়ে কিছু গপ্পো ফেঁদে খবরের ব্যবসা করতে এসেছিস্? এ নিয়ে নাফা কামাতে লজ্জা করে না?

অতএব বৌদির ভায়ের গল্প ফেঁদেছি। কারণ ওকে বোঝানো যাবে না, মানুষেব সব থেকে বড় দুর্দিনের কথা নিয়েই এ জাতের ব্যবসা চমৎকার জমে। দশজনের সব থেকে বড় বিপর্যয় কারো কারো সামনে সব থেকে বড় সম্পদ আর যশের দুয়ার খুলে দেয়।

আমার ভাবভঙ্গি দেখে ও শুধু বিশ্বাসই করল না, হয়ত আমার মিথ্যা আবেগ-উৎকণ্ঠার শরিকও হয়ে গেল। সজোরে একটা নিঃশ্বাস টেনে বলল, তাহলে তো দেখতে হয়, খোঁজ নিতে হয় এক্ষুনি, কী অবস্থা!

যাব সঙ্গে?

না, না, আগে ভাবভঙ্গিটা বুঝে আসি, তারপর তেমন ব্যবস্থা করে নিয়ে যেতে হবে তোকে।

তাহলে যা করবি চটপট কর। দেরী করিস্‌নি।

দেখি। বোস্, ঘুরে আসি আমি। যা পরেছিল ও, স্পোর্টস্ গেঞ্জি আর চাপা প্যাণ্ট, সেই বেশেই চপ্পল গলিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ও বেরিয়ে যেতে পরের কায়দার জন্যে কীভাবে এগোব তাই ভাবতে লাগলাম। সন্তর্পণে, খুব সন্তর্পণে কাজের সঙ্গে কথার মিল রেখে এগোতে হবে। সংগ্রহ করতে হবে সঠিক সংবাদ। তুলতে হবে ছবি। শুধুমাত্র রটনা আর লোকের মুখফেরতা কথায় কথায় কভার সাবলে চলবে না।

মনে পড়ছিল সাম ওয়েনের কথা।

গ্র্যাণ্ড বিল্ডিং-এর দোতলায় আর্ট কালেকশান এজেন্সির যে শো-রুমটা, তারই এক কোণে নিভৃত নিরালা এক এনক্লোজারে বসে সিপ্ করতে করতে প্রস্তাবটা পেড়ে বসেছিল সাম ওয়েন। একটা এ্যাপয়ণ্টমেণ্টের ফলশ্রুতি এই প্রস্তাব আর এ্যাপয়ণ্টমেণ্টটার আয়োজন ভারী চমকপ্রদ।

প্রস্তাব দিয়েই বলেছিল সাম ওয়েন: রিপোর্টিং হবে নীট আর ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট। ডকুমেণ্টারীও হবে, সেজন্যে ছবিও চাই। অবশ্য স্বীকার করি কাজটা রীতিমত দুঃসাধ্য। তবুও একমাত্র তোমার ওপরেই নির্ভর করতে পারি এই ব্যাপারে।

কিন্তু ছবি হবে কেমন করে? যা আভাস দিচ্ছ, তাতে ক্যামেরা নিয়ে ঘোরা যাবে না তো।

সেটা তুমি বুঝবে। একটা উপায় করতে পারি, যদি সেটা ম্যানেজ করা সম্ভব হয় তোমার দ্বারা। আর অবশ্যই যদি তুমি রাজী থাক। তবে খুব কেয়ারফুলি চলতে হবে।

সমস্ত ব্যাপারটাই তো কেয়ারফুলি করার।

গো'জ উইদাউট সেইং! মাইক্রো-ক্যামেরা দেখেছ?

না।

সিক্রেট সার্ভিসে কদাচিৎ এর ব্যবহার হয়। অন্য ক্ষেত্রে তো নয়ই। আসলে এটা একটা পরীক্ষামূলক হাতিয়ার। ইলেকট্রনিক অপারেশন। দেখে বুঝে নিতে পারলেই ভারী সহজ হয়ে যাবে কাজটা। জাস্ট একটা—

ছোট্ট যন্ত্র, যা দেখে মনে হবে একটা চাবি রাখার চাকতি বই নয়। বের করে তার সমস্ত অপারেশন দেখিয়ে আমাকে তালিম দিয়েছিল সাম ওয়েন। দেখে চমকে উঠেছিলাম। তারপরে একসময়ে কথাবার্তা সারা হল। নেহাৎই ঝোঁকের মাথায় নিয়ে ফেললাম দায়িত্বটা।

সেই জিনিসটা এতক্ষণে হাতব্যাগে রেখেছি। সেখানেই পড়ে আছে। আঙুল দিয়ে আন্দাজ নিলাম ওপর থেকে। ঠিকই আছে যথাস্থানে।

কখন মুরারি ফিরবে কে জানে? বেরোতে পারব কিনা তাও নেহাৎই অনিশ্চিত। সময় বয়ে যাচ্ছে। যতদূর জানি, এখানকার এই রোমহর্ষক নাটকের মেয়াদ কাল অর্থাৎ পরের দিন পর্যন্ত। মনে মনে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি রীতিমত। একলা বেরিয়ে পড়ার একটা ঝোঁকও এল। কিন্তু ভুলতে পারলাম না এমন সময়ে এ জায়গায় একা বাইরে যায় নির্বোধ।

মুরারি বলছিল, ওপর থেকে 'পকেট এরিয়া' দেখা যায়। কিন্তু দেখি কেমন করে? কী ভেবে যে একটা বাইনোকুলারও সঙ্গে এনেছিলাম জানি না। সেটার কথাও মনে পড়ে গেল। উঠে পড়লাম। তাড়াতাড়ি হাতব্যাগ থেকে বাইনোকুলার আর

মাইক্রো-ক্যামেরা বের করে সিঁড়ি ধরলাম। বাচ্চা চাকরটা নিশ্চয় একতলায়।

কিন্তু তিনতলায় থমকে গেলাম না। চারতলার বারান্দাই যেন কেমন জুৎসই মনে হচ্ছিল আমার কাছে। তিনতলার ছোট ঘরদুটো খালি পড়ে আছে। মুরারির ছেলে-মেয়েদের পড়ার ঘর। চার-তলাতেই ওর খাস-কামরা।

উঠে দেখলাম, এ-ঘরটাও খোলা। মুরারির আত্মবিশ্বাসকে বাহাদুরি দিতে হয়। বড়সড় ঘরখানার তিনদিকে ব্যালকনি।

কোনদিকে আমার অভীষ্ট 'পকেট এরিয়া' আমি জানি না। জিওগ্রাফিটা মোটামুটি আন্দাজে আনার চেষ্টা করতে করতেই এক একটা দিক বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে স্বুরু করলাম। চারপাশে কিছুদূর অবধি বেশ থমথমে। কেউ যেন একটা গণ্ডি কেটে ক্যানিউটের সমুদ্রতরঙ্গ রোধের ব্যর্থ আদেশ সফল করে জীবনতরঙ্গকে তিষ্ঠ করে দিয়েছে।

ঋষি বঙ্কিমের বর্ণনা মনে পড়ে গেল—ভিখারীরা ভিক্ষা করিতে বাহির হয় নাই।······এ বোধহয় আর এক ধরণের মন্বন্তর হচ্ছে এই জায়গায়।

রাস্তায় লোকজন একেবারেই নেই। বাড়ীগুলো সব ভারী চুপচাপ। কোন কোনটার দরজা জানলা একেবারে বন্ধ। ভেতরে মানুষজন থাকার আভাস মিলছে না। রাস্তার কলগুলো যেন এক অখণ্ড অবসাদে পরম তৃপ্তিতে নিরন্তর একাকিত্ব ভোগ করছে। নিঃসঙ্গ দু-চারটে কুকুর অনাথের মত ঘুরছে ইতস্ততঃ। এক-আধটা খেলার মাঠ অপরাহ্ণের কলকোলাহল বর্জিত হয়ে বিষণ্ণতা মেখে আছে। শুধু স্থানে স্থানে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। বোমা ও গুলির শব্দ। চারিদিকের আর্তনাদ যেন রুদ্ধ হয়ে প্রাণভরে স্বাভাবিকতা কামনা করছে।

হঠাৎ একটা মোড়ে জনাকয় লোক চোখে পড়ল।

বাইনোকুলার চোখে তুললাম। জটলা? না। একটা আধবুড়ো

লোককে ঘিরে একটা দল, সশস্ত্র দল। খুব সাদাসিদে পোশাকের গোবেচারী চেহারার আধবুড়ো লোকটা দু'হাত এক করে কিছু বলছে, হাবভাবে ধারণা হয় কাকুতি-মিনতি করছে। দলটা যেন তার কাছে কোনকিছুর জবাবদিহি করতে চাইছে। প্রায় কাঁদো কাঁদো ভঙ্গি হল লোকটার। শেষ অবধি, হ্যাঁ—কেঁদেই ফেলল। দলের যাকে সামনে পেল পা জড়িয়ে ধরতে গেল।

কিন্তু এর পরে কী দেখলাম? একি লেখা যায়? বাইনোকুলারের আব্রুর মধ্যেও চোখদুটো জ্বালা করে উঠল। মনে করলাম, অতদূর থেকে, নীচে থেকেও রক্ত ফিনকি দিয়ে এসে লাগল আমার চোখে। অস্ত্রটা দেখতে পেলাম না, দেখার মন ছিল না। দেখছিলাম অসহায় মানুষটাকে—অশ্রুত আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই যে লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়। আবার পরের পর আঘাত হল তার দেহের ওপর। কয়েকবার ছটফট করেই স্থির হয়ে গেল দেহটা। দলের মধ্যে কেউ কেউ পা দিয়ে ঠেলাঠেলি করে দেখল দেহটা নড়ে কি না।

এর মাঝেই কখন মাইক্রো-ক্যামেরাটা ঘটনাস্থল বরাবর ধরেছি। ছোট বোতাম টিপে স্ন্যাপ-অন করেছি। দৃশ্যটার কতগুলো পর্যায় সেখানে ধরা হয়ে গেছে, বোঝার জন্যে ইণ্ডিকেটার দেখে নিলাম।

নিথর দেহটা থেকে খানিক তফাতে সরে গেল দলটা। বোতলে করে একজন কিছু নিয়ে এল, ছিটিয়ে দিল তার ওপর। তারপরেই একটা জ্বলন্ত কাঠি এসে পড়ল সেখানে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল লেলিহান শিখা। বোঝা গেল দেহটায় এখনো প্রাণ নামক বড় কঠিন বস্তুটি রয়ে গেছে, কারণ ছটফট করে ওঠার চেষ্টা স্পষ্টই চোখে পড়ল। পারল না, শুধু গড়াগড়ি খেল। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দলটা দেখছিল সেই দৃশ্যটা।

আবার নজর ঘোরালাম অন্য অন্যদিকে। সেই আগেকার অবস্থা। আনমনাভাবে বাইনোকুলার নামিয়ে, মাইক্রো-ক্যামেরা হাতের মুঠোয় রেখে দূরে নজর দিচ্ছিলাম।

মনে হচ্ছিল, মুরারি এতক্ষণে ফিরল কি না। ফিরলেই আমায় খুঁজবে। এখানে চলে আসা বিচিত্র নয়। বাইনোকুলারটা চোখে পড়বে ওর। ক্যামেরাটা চোখে নাও পড়তে পারে। পড়লেও বড়জোর বলবে, ওটা আবার কী? এসবেরই জবাব দেওয়া যাবে। কিন্তু যদি বলে বসে, কাগজে লেখার জন্যে ছোঁক ছোক করে বেড়াচ্ছিস নাকি রে? চট করে কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারব কি?

এই যে, শুনছেন?

কয়েকটা বাড়ীর পরে একটা বাড়ীর তিনতলার ছাদ থেকে কেউ কাউকে ডাকছে। আমায় নাকি? সেদিকে চেয়েই ধাক্কা খেলাম। দস্যু মোহনের আলট্রা-মডার্ণ ছদ্মবেশ কিনা জানি না। তবে নাক-মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একমাথা ভুতুড়ে চুলওয়ালা একজনকে দেখলাম। স্টেনগান নিয়ে আমার দিকেই চেয়ে আছে। মুখের ওপর থেকে রুমাল সরিয়ে কথা বলল আবার:

আপনাকে বলা হচ্ছে। ওখানে দাঁড়িয়ে কী রঙ লিচ্ছেন, এঁ্যা? ছ্যাঁলেমি করবেন না। যান, ঘরে যান।

রীতিমত আদেশ। সুতরাং মানতেই হল।

তখনো ফেরেনি মুরারি। সেই একই অবস্থা বাড়ীটার। বাচ্চা চাকরটা একা একতলায় কী করছে কে জানে? মাইক্রো-ক্যামেরা আর বাইনোকুলার ব্যাগে ভরলাম। তারপর তখনকার মত নোট করতে বসলাম।

ডায়েরি লেখার বাতিক নেই আমার, অভ্যেসও নেই। ধৈর্যের বড় অভাব। কারো কারো থাকে। যা নিয়ে কাব্য হয় কিংবা সাহিত্য হয়। নাটকও হতে পারে। সে সবকিছুর কোনটাই এমন এলোমেলো ছন্নছাড়া লেখা দিয়ে হয় না। আর ছাই ওসবের চাষবাসও নেই। সমব্যবসায়ীদের মতঃ নোট বা জট্ ডাউন করে পরে বসে গুছিয়ে লিখি। কিন্তু এখানকার ব্যাপারে আমার আসার

একটা পটভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া এমন লিখে রাখার কোন আগুপিছু হদিস মেলে না। মনে হয়েছে, কেন এলাম তা তো জানলো না কেউ। এরপরে হঠাৎ কোন মুহূর্ত যদি অন্তিম হয়ে দেখা দেয় নিখোঁজের তালিকায় স্থান পেতে পারি। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে এ কাহিনীর অভিজ্ঞতা কারো কাছে পৌঁছে দেবার মত করে রেখে যাই, হয়তো কেউ না কেউ জানতে পারবে। তাই সুরু করলাম লেখা :

সূত্রপাত সাম ওয়েনকে নিয়ে। তাকে অনেকেরই না চেনার কথা। কেন না, নিউ জার্সির এই যে যুবক নিবিষ্ট হয়ে গত কয়েক বছর ধরে শহর কলকাতায় থেকে বাঙলা আর বাঙালীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার সাধনা করছে, পাদপ্রদীপে এসে নাম কেনার সুযোগই তার না ঘটার কথা। ফ্রীওয়ার্লড ফ্রেণ্ডশীপ মিশন-এর কাজে এসে সে বুঝি ভালোবেসে ফেলেছে এই দেশ ও তার মানুষগুলোকে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আমারই এক বান্ধবী, সুচিরা। সমাজ-সেবিকা বলেই সুচিরার পরিচিতি আর আমাদের মহলে ওর বেশ স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। বেশ কিছুকালের বন্ধুত্ব। কোন এক অনুষ্ঠানে, মনে করতে পারছি না ঠিক, ওর মারফৎ আলাপ হয় সাম ওয়েনের সঙ্গে। আভাস দিয়েছিল সুচিরা, সামের সঙ্গে বিশ্বের বড় বড় নিউজ ম্যাগাজিনগুলোর কর্তা-ব্যক্তিদের জানাশোনা আছে। যে কোনকালে এ আলাপ কাজ দিয়ে দেবে।

তখন কাজের কথা ভাবিনি। আলাপ করে ভাল লেগেছিল। সামেরও নাকি ভাল লেগেছিল। তারপর থেকে প্রায়ই মাঝে মাঝে ও আমায় ডাকত। নিয়ে যেত বার-এ বা অন্যত্র। অনেকদিন গঙ্গার ধারে বসে গল্প করেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কখনো বা ময়দানে কোন গোলমোহর বা কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার নীচে বসে অপরাহ্নের ব্যস্ত গৃহকর্ত্রী চৌরঙ্গীকে সন্ধ্যার মোহিনী পসারিণী সাজতে দেখেছি দূর থেকে। বন্ধুত্ব দৃঢ় থেকে হয়েছে দৃঢ়তর।

সেই. সাম একদিন ক্লাবে জরুবী শমন পাঠাল টেলিফোনে। গ্রাণ্ড বিল্ডিং-এর দোতলায় আর্ট গ্যালাবীতে আসতে হবে অবিলম্বে, জরুরী দরকাব। শিল্পে সবকারী ব্যবস্থাপনার ওপর একটা ফিচার লেখাব ফবমায়েস ছিল। সেটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু কোন অজুহাতই শুনল না সাম। সোজা বলে দিল, এক্ষুণি এসো। কী দবকাব জিজ্ঞাসা কবতে বলল, আমাকেই দবকার। এ্যাপয়ণ্ট্মেণ্ট্টা এমনি আকস্মিক।

আটটায় হাজিব হওযাব কথা। কিন্তু সাড়ে আটটাব আগে পৌঁছতে পাবলাম না।

ওপবে উঠেই বিসেপশান এনক্লোজাবেব সামনেই সুচিবা। ওকে আশা কবিনি। তবুও এমন বেশে দেখে ভাল লাগল। ভাবী সুন্দব সেজেছে ও। ফর্সা বঙেব সঙ্গে অনাড়ম্বব সাদা শাড়ীব ওপব গাঢ় নীল বঙেব প্রিণ্টগুলো ওব যৌবনে বেঁধে বাখা দেহবল্লবীকে দিয়েছে অপরূপ কমনীয়তা। কোন অলংকাবই আজ পবেনি ও। একবাশ স্যাম্পু-কবা কুচকুচে চুল সাদাসিদেভাবে বাঁধা। দেখে আপনা-আপনিই আমাব মুখ দিয়ে বেবিয়ে গেল, বাঃ! লাভ্লি

কে? আমি?

সামনে তো ছবি নেই!

থ্যাংক্স্ ফব দা কম্প্লিমেণ্টস্ উজ্জ্বল মুখে বলল সুচিবা।

এখানে কী ব্যাপাব? তোমাব সোসাইটিব কোন অকেশান আছে নাকি?

কেন এখানে আসতে নেই বুঝি? কটাক্ষ কবল ও।

অবশ্যই আছে। কিন্তু যে বেশে তোমায় দেখছি এমন মোহিনী রূপ দেখাব উপলক্ষ্য জানতে ইচ্ছে কবছে।

জানো, আপাততঃ তোমাব চার্জ আমার, এসো।

কোথায়?

এসোই না। হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল সুচিরা। খুব ঘনিষ্ঠ

সান্নিধ্যে আমাকে এনে কানে কানে প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল : একটু বসতে হবে তোমায়। সাম এখুনি এসে পড়বে।

কিন্তু নিয়ে চললে কোথায় ?

যেখানে বসবে তুমি।

আর কোন কথা বলার নেই। নিজের আসতে দেরী হবে বলে স্নুচিরাকে রেখে যাবে সাম, এমনটা স্বাভাবিক মনে হল না। তবুও যেজন্যে এসেছি তারই অপেক্ষায় থাকাব পক্ষে স্নুচিরার সঙ্গ বিরক্তিকর না লাগারই কথা।

প্রকাণ্ড আর্ট গ্যালারীটার এক দূর কোণে আমাকে টেনে নিয়ে গেল স্নুচিরা। একান্ত আর একটা এনক্লোজারে বসলাম দু'জনে। চারদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে গেলাম, গ্যালারীর লোকজন অতিথি অভ্যাগত খরিদ্দার সবাই যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। দু'একজন আড়চোখে স্নুচিরার দিকে চাইল।

স্নুচিরা বসেই বলল : তোমারই আজ আমাকে কিছু অফার করা উচিত।

করছি। বল দেবি, কিসে তুমি তুষ্ট হবে ?

ফাজলামি করো না, প্লীজ।

ফাজলামি নয়। বিশ্বাস করো আজ তোমার এই বেশ যে আমার বুকের মধ্যে কী—

সেই জোক্‌ করছ ! ওঃ ! একটু সিরিয়াস হও, ফর হেভেন্‌স্‌ সেক্‌।

আমি কিন্তু সিরিয়াস। এতদিন কখনো তোমাকে এমন মোহিনী বেশে দেখিনি। আজ দেখে—

নাঃ, সেই তুমি বাজে বাজে বকছ ! তোমার জন্যে আমি এত করছি। যাকগে, শোন।

বল।

অনেকদিন ধরেই তোমার কথা বলছি ওকে।

কী কথা ?

তোমায় যাতে কোন ইণ্টারন্যাশানাল নিউজ জার্ণালে চান্স দেয়। কোন কথা বলে না। আজ মাত্র ফোন করে বলল আমায়, একটা গ্র্যাণ্ড চান্স এসেছে। তোমাকেই দেবে এ্যাসাইনমেণ্টটা। তুমি যেন আবার ইয়ে করো না।

ইয়ে করব কেন বল? আমার যা প্রফেশন তার এ্যাসাইনমেণ্ট এলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলব?

ঠেলতে পারো। বিশ্বাস নেই তো তোমাকে! যা খেয়ালী মানুষ তুমি। মনে রেখো এটাতে তোমার নেম, ফেম, রেপুটেশান সবই বেড়ে যাবে। আর ভালো রেমুনারেশান পাইয়ে দেবে ও।

এত ভাল খবর দিচ্ছ যখন—তখন তোমাকে অবশ্যই—

থাক্। অত আর ভদ্রতা দেখাতে হবে না। যা বলছি শোন, সাম না ... তাতেই রাজী হয়ে যেও। নইলে আমার মুখ থাকবে না। অনেক বড় মুখ করে বলেছি ওকে। এটা সাকসীড করলে আরো বড় বড় কাজ দেবে ও তোমাকে।

ধন্যবাদ সুচিরা। কিন্তু এ্যাসাইনমেণ্টটা কী?

ও আসুক না। শুনবে ওরই কাছ থেকে।

একটু আভাস দেবে না?

বিশ্বাস করো, ডিটেল্স্ কিছুই জানি না।

কিন্তু তুমি তো জানো, যে কোন খবরের নিছক বাণিজ্য করি না আমি। নীতিতে না বাঁধলেই—

প্লীজ, দোহাই তোমার! ঐ সব কনসেন্সের ফ্যাকড়া তুলে বসো না। তোমার ফিউচার গড়তে গেলে যদি বা একটু-আধটু প্রিন্সিপল্ থেকে সরতে হয় মানিয়ে নিও। এটা আমার অনুরোধ, মিনতি। দুহাত দিয়ে হাত চেপে ধরল ও আমার। কথা দাও, এ্যাক্সেপ্ট করবে?

কিন্তু সুচিরা, এমন অন্ধকারের মধ্যে থেকে কেমন করে কথা দিই তোমায়?

অন্ধকার নয়। কিছুই অন্যায় করতে বলবে না সাম। তবুও তোমায় এত করে বলছি, কারণ তোমার জন্যে সত্যি ফীল করি আমি। একটু বিশ্বাস করবে না আমায়? কতদিন তো মিশছি তোমাদের সঙ্গে, কোনদিন তোমার কাছে তেমন কোন অপরাধ করেছি কি? বিশ্বাস করো, আমার মুখ রাখো।

' ওর মিনতি দুর্বল করে দিল আমায়। এতদিন ও মিশেছে বন্ধুর মত। ওর সমাজসেবা মানে উচ্চকোটির মহিলাদের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে তাই। তা নিয়ে কোন ধারণা করাব নেই ওর সম্বন্ধে। এত দিনের মেশামেশির পেছনে একটু পাবলিসিটি পাওয়া ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়ার কথাও নয়। তবুও হঠাৎ আমার সম্বন্ধে ওর এতখানি আগ্রহের অন্তরালে শুধু একটা জিনিসই অনুভব কবলাম, যা খুবই স্বাভাবিক।

চাইলাম ওব মুখেব দিকে, চোখদুটোব দিকে। পড়লাম সেই জ্বলজ্বলে ভাষা যাতে থাকে সমর্পণের আকুতি, নিবেদনের অর্ঘ্য। এটুকু পাঠে কোন বিভ্রম ছিল না। থাকাব কথাও নয়

আচ্ছা।

কথা দিচ্ছ? টস্‌টসে গলাব স্বব ওব।

দিচ্ছি।

ওঃ, বাঁচলাম। কী ভয়ই যে ছিল! যেন নিশ্চিন্ত হল ও।

ভাবতে ভাল লাগছে, সুচিরা তুমি আমার জন্যে এতখানি করলে! তবুও একটু শান্তি যে কেউ না কেউ আমার কথা নিয়ে মাথা ঘামায়।

জানতে পারলে তো? এবার?

এবার আর কী? আরো কিছু যদি জানতে চাই, বলবে?

না, এখন না।

কী জানতে চাই বল তো?

কটাক্ষ করল সুচিরা। বলল, উঁহু! তাও বলব না।

এনক্লোজারে দীর্ঘছায়া পড়ল একটা। আবেশটুকু ছিন্নভিন্ন হল।

হ্যাল্লো বেবি! হাত বাড়িয়ে দিল সাম ওয়েন। কতক্ষণ?

আধঘণ্টা হবে।

তাহলে তুমিও লেট্? দু'জনেই লেট্। যাই হোক্, দেরী যখন আমিও করে ফেলেছি বেগ ইওর পার্ডন।

মাথা ঝুঁকিয়ে বসে পড়ল সাম। তারপরে বলল, কী করি বল? এমন একটা জরুরী ব্যাপার এসে গেল।

তোমার আবার এত জরুরী ব্যাপার কিসের? প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

আর বলো না। মিশনের কাজ দিন দিন বাড়ছে। কত রকমের লোকের সঙ্গে যে দেখাসাক্ষাৎ করতে হয়, যোগাযোগ রাখতে হয়! সময়ই পাচ্ছি না আজকাল।

কেমন লোকেব সঙ্গে আবার তোমাদের মিশনেব কাজ?

শুনবে? হাই অফিসিয়াল্স্, বিজনেস ম্যাগনেট্স্, ডক্টর্স্, লীগ্যাল প্র্যাকটিশনারস, স্টুডেন্টস্, পলিটিসিয়ান্স্, সোশ্যাল ওয়ার্কাস, এ্যাণ্ড সো অন। হ্যাঁ, নিউজমেনও আছে। কিন্তু সে সব থাক। শুনবে'খন পরে। সব বলব তোমায়।

হঠাৎ গম্ভীর হল সাম। তারপর সোজাসুজি আমার দিক চেয়ে বলল, সকালবেলা থেকেই খালি খালি তোমার কথা . .ন পড়ছে। সুসি, ড্রিংক্স প্লীজ।

উঠে গেল সুচিরা।

মনে পড়ার মত ঘটেছে কিছু নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ। একটু হাসল সাম ওয়েন, তারপরে বলল, একটা অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটে গেছে। সেই সূত্রেই এমন মনে পড়া।

ব্যাপারটা কী?

বলছি। পানীয় আসুক। তারপরে শুরু করা যাবে। তোমাকে একটা কনগ্র্যাচুলেশান দিতে হবে তার আগে।

হঠাৎ আমাকে নিয়ে পড়লে কেন? মনে হচ্ছে, তোমার দস্তুরমত মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি।

হ্যাঁ, এখনকার মত। গত রবিবার ন্যাশন্যাল টাইমস-এ তোমার যে কভারটা বেরিয়েছে—ইন্‌ভেস্ট্‌মেণ্ট এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল ম্যানুভার-এর ওপর, সেটা খুব ভালো লেগেছে। কন্‌গ্রাচুলেশানটা সেজন্যে।

সৌভাগ্য বলতে হবে।

দুর্ভাগ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে। সে যাক্‌, আমার মতে তোমাকে ইণ্টারন্যাশানাল পত্রপত্রিকাগুলোতে লেখার সুযোগ দেওয়া উচিত।

তাই নাকি?

ঠাট্টা করছি না। আন্তরিকভাবেই বলছি বিশ্বাস কর। তোমার কোন কোন কভার পড়েছি আমি। মনে হয়, ফ্রী লান্স আছ বলেই একটা স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে পার। আর বেশ খুঁটিনাটি দুষ্প্রাপ্য তথ্যও জুড়ে দেবার বাতিক আছে দেখছি।

আসল কথাটা কী বল দেখি। ডাকিয়ে এনে শুধু গ্যাস দিয়ে চলেছ, নিশ্চয়ই কারণ আছে কোন। এবার ঝাঁপি খুলে ফেল।

ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এতদিনের মধ্যে এই প্রথম অকারণে দেখা করছি না আমরা। পানীয় আসুক। আচ্ছা, টেড্‌ ডিক্‌শনের নাম শুনেছ বোধহয়। একটু থেমে শেষের কথাটা বলল সাম।

শুনেছি বই কি।

টেড্‌ আমার ওল্ড ফ্রেণ্ড। হঠাৎ আজ দুপুরে আমাকে ট্রাংককল করে বসল হায়দ্রাবাদ থেকে।

ডিকশন কি এখনো আগের সেই জার্ণালে আছেন?

হ্যাঁ। এখনো ফোকাস-এই আছে। এখানে, মানে ইণ্ডিয়াতে ওর মিশন ছিল একটা। তার মধ্যেও শ্রীকাকুলাম কভার করেছে ইতিমধ্যে। ওরা এইসব নিয়ে একটা রিলে কভারেজ করবে। সেই ব্যাপারেই ফোন করেছিল আমায়। সাহায্য চেয়েছে। এখন আমার দরকার তোমার সাহায্য।

অর্থাৎ আমাকে বিশেষ কোন এলাকা ঘুরতে হবে, রিপোর্টিং করতে হবে ?

নিঃসন্দেহে।

কোথায় ?

পানীয় দিয়ে গেল উর্দিপরা ওয়েটার। সুচিরা উঠে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে কখন আবার এসে আমাদের মাঝে বসে পড়েছে দেখিনি। স্লিভলেশ হাতদুটো ওর সক্রিয় হল। পানীয়ের অন-দ্য-রক্‌স্ নিল সাম। সাদামাটা নিলাম আমি। কথাটা সুরু করেছিল সাম তার পরে।

ডিক্‌শান জেনেছে কোন শহরতলীতে আজ থেকে এন্‌কাউণ্টার সুরু হয়েছে। গেরিলা ধরণের কমব্যাট চলছে। এটার নিখুঁত বিবরণ চাই ওর। কোন নির্ভরযোগ্য সাংবাদিকের সাহায্য দরকার এ কাজে।

আরো গুছিয়ে ব্যাপারটা বলেছিল সাম। ফোকাস্-এর মত নাম-ডাকওয়ালা কাগজে এসবের রিপোর্টিং বেরোবে। পারিশ্রমিক পাব অবশ্যই। পরিমাণ অনেক এদেশের নিরিখে অকল্পনীয়। ডিক্‌শন নিজে খুব ব্যস্ত। আজই মাদ্রিদ রওনা হয়েছেন তিনি একটা জরুরী খবর স্কুপ করতে।

শুনে বললাম, খবরটা যা পেয়েছেন উনি সেটায় বাড়াবাড়ি আছে। আমাদের প্রেস-মহলের খবর হল, এলাকাটা উপদ্রুত বেশ কিছু কাল থেকে। চরম-গরম কার্যকলাপ আর তার প্রতিক্রিয়া আছে। নতুন কিছু নয়। তেমন বললে খোদ শহরেরই কোন কোন পাড়া বা এলাকায় এমন ব্যাপার চলছে।

না, তা নয়। মাথা নাড়ল সাম। খবর হচ্ছে এই যে সেখানে নিয়মিত লড়াই লেগে গেছে! ডিক্‌শন বাজে খবর পায় না, বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। নিশ্চয় কোন গুরুতর কাণ্ড হচ্ছে সেখানে।

খবর পেলেন কী করে উনি? শহরে এসেছিলেন?

রহস্যময় হাসল সাম। বলল: না এলেও খবর ঠিক ঠিক পায় ওরা। দুনিয়ার যেখানে যখন কিছু ঘটতে চলেছে বা যাই ঘটুক না কেন, ওরা ইচ্ছে করলে মুহূর্তের মধ্যে তার আভাস পাবে। একেবারে অভ্রান্ত হদিস মিলে যায় ওদের।

কিন্তু জান তো, এখনকার সব ব্যাপার? ওরা সাংবাদিকদেরও রেহাই দিচ্ছে না। যাকে ওরা মনে করবে শত্রু তাকে প্রাণ দিতেই হবে। কাজেকাজেই—

আরে, ও তো হবেই। জানো, ক'জন সাংবাদিক ভিয়েতনামে আমাদেরই সৈন্যদের হাতে মরেছে? কিন্তু তাই বলে কি জার্নালিস্টরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে?

মরল কেন?

মারল কেন তাই জিজ্ঞাসা কর। ওটা মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। যেমন ধর—এইতো গত বছর খোদ ডালাসে এক ফ্রী ল্যান্স খুন হল ক্যু-ক্লুক্স্-ক্ল্যানের হাতে।

নিগ্রো বলে?

না, না। সাদা চামড়া। তার অপরাধ, ছবি তুলেছিল।

কীসের ছবি?

রেপ্ অ্যাণ্ড্ দেন লিঞ্চিং!

কালার রায়ট?

একটা নিগ্রো যুবতীকে ধরে এনে চারজন সাদা চামড়া প্রকাশ্য দিবালোকে ডালাসের রাজপথে একের পর এক বলাৎকার করল। তারপরে তাকে একটা থামের গায়ে বেঁধে লিঞ্চ করতে সুরু করল। কাছাকাছি একটা হোটেলের দোতলার জানলা দিয়ে রবার্ট ও'নিল ঘটনাক্রমে সেটা দেখে মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলতে থাকে একের পর এক। রবার্ট অবশ্য তখন ওখানে কালার রায়ট কভার করতেই গিয়েছিল। দুষ্কৃতকারীরা রবার্টকে লক্ষ্য করে। কাজ শেষ করে

তারা সোজা হোটেলের দোতলায় রবার্টের ঘরেই এসে হাজির হয়। বিনা বাক্যব্যয়ে ওকে গুলি করে মেরে ফেলে আর ক্যামেরাটা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে চলে যায়।

বাঃ! থ্রিলিং!

হ্যাঁ। শুধু থ্রিলিং নয়, তারও বেশি কিছু। আসলে রিস্কি বলতে পার। কেউ কোন খবর যদি চাপা দেওয়াতে চায়, সম্ভব হলে সে খবর জোগাড়ের আসল যন্ত্রটাকে নষ্ট করে দেবে। অনেকে লোভ দেখায়, ভয় দেখায়। কাজ না হলে শেষ অস্ত্র সাংবাদিকের জীবনের ওপরেই মর্মান্তিকভাবে নেমে আসে। কেউ আবার সোজা-সুজি প্রথম চোটেই শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে।

তেমন সম্ভাবনা তো এখানেও থাকার কথা।

ঠিক জানি না তোমাদের দেশে কী হয় এসব নিয়ে। অবশ্য যে ব্যাপারে যাচ্ছ তুমি, আমি যতদূর খবর পেয়েছি তাতে গ্যাগিং-এর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এসব জেনেই তোমাকে এগোতে হবে।

পৈতৃক প্রাণটা তাহলে খোয়াতে বলছ?

উঁহুঃ। প্রাণটা বাঁচিয়েই ফিরতে হবে, নইলে তোমায় পাঠানো কেন? আমাদের আরো খবর হচ্ছে, সংঘষটা চলতে পারে তিনদিন।

বাব্বা! এত খবর? তাহলে অন্য খবর বা বিশদ বিবরণও তোমরা ওখানে না গিয়েও পেতে পার।

না, তা পাওয়া যায় না। এসব খবর সাধারণত স্পেকুলেটিভ্ হয়। সংঘষ হচ্ছে ঠিক। প্রচণ্ড লড়াই। তবে ওয়াকিবহাল লোকের ধারণা এমন ব্যাপারটা কমপক্ষে তিনদিন স্থায়ী হবে। কারণগুলো বলব তোমায়। ঘুরে এসো আগে কভার করে। নইলে ঠিক বুঝবে না এমন আন্দাজের ভিত্তি কী।

খানিকক্ষণ চুপচাপ রইলাম দু'জনে। কোন কথাই বলছিল না সুচিরা, শুধু মাঝে মাঝে চোখোচোখি হচ্ছিল ওর সঙ্গে।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কোন মাথামুণ্ডু বুঝলাম না। সংবাদ-জগতের সঙ্গে সাম ওয়েন এমনভাবে জড়িত তা জানা ছিল না। টেড্ ডিক্শনের মত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সূত্রে বন্ধুত্ব থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। যেটা আমার কাছে অজানা ছিল সেটা হল, টেড ডিক্শনের এমন সব সংবাদ প্রচেষ্টার সঙ্গে সাম ওয়েন এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অদ্ভুত অদ্ভুত চমকপ্রদ সংবাদ জোগাড় ও নাড়া দেওয়ার মত করে পরিবেশনের অপূর্ব মনীষীয়ানার জন্যে টেড্ বিশ্বখ্যাত। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য বড়ের বেগে সুনিপুণভাবে 'কভার' করেন। অপ্রত্যাশিত খবরের আচমকা পূর্বাভাস দিয়ে অনেক চাঞ্চল্য ঘটিয়েছেন। রাজনীতি ও অর্থনীতির ব্যাপারে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বার বার অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বিরাট বিরাট লোকেদের অনেক কীর্তিকলাপের গোপন খবর ইনসিসিভ্ স্কুপিং করেছেন।

এ হেন টেড্ ডিক্শন ভারতের কোন কোন অখ্যাত প্রান্ত প্রত্যন্তে যে মারণযজ্ঞের বিভীষিকা চলছে তা নিয়ে হঠাৎ আগ্রহী হলেন কেন? তাঁর পক্ষে সাম ওয়েনই বা উদ্যোগী ভূমিকা নিতে যাচ্ছে কী কারণে? এগুলো ধাঁধাঁ। কিংবা ধাঁধাঁ নয়, খুব স্পষ্ট কোন আন্তর্জাতিক স্বার্থের ছায়া পড়ছে নাকি এর ওপর?

মনের কথাগুলো বোধহয় বুঝতে পারছিল সাম। বলল:

তোমার সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য ষোল আনা সাংবাদিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। আর আমি চাইছি, তুমি অর্থ আর যশ দুটোই পাও এই উপলক্ষ্যে। তুমি চাও না?

চাই। তবে সেজন্যে অবশ্যই তুমি বিবেকবর্জিত হতে বলবে না।

না, বলব না। কিন্তু এই কাজটার মধ্যে বিবেক বর্জনের কোন প্রশ্ন নেই। সত্য ঘটনা যা দেখবে তাই লিখবে। তোমার নামেই তা ছাপা হবে ফোকাস-এ। একটা প্রতিষ্ঠা পাবে আন্তর্জাতিক

দরবারে। সেটা কি বড় কম কথা? টাকা-পয়সার প্রশ্ন না হয় বাদ দাও আপাততঃ।

কিন্তু এখানকার পত্রিকাগুলোতেও তো ঐ রিপোর্টিং হবে।

ভরসা করছি, হবে না। তার নানা কারণ আছে। আসল কথা, প্রস্তাবে রাজী কিনা, এক কথায় বলে দাও। আমার সময় নেই। আজকের মধ্যে আমাকে এ ব্যাপারটায় যা করার করে ফেলতে হবে।

একটু ভাবার সময় দেবে না?

না বন্ধু, ভাবার কোন অবকাশ নেই। তোমাকে এখুনি জানাতে হবে। তবে আমি আশা করি, তুমি না বলবে না। কারণ, এমন কাজের যে থ্রিল আর এ্যাডভেঞ্চার আছে তা রীতিমত লোভনীয়।

এমন এ্যাসাইনমেন্টই স্যুট করবে তোমার, আমি জানি। এতক্ষণ পরে চোখের নজর বেশ ভারিক্কি করে বলল সুচিরা।

আবার মনে হল, তাইতো জানতাম না এতটা ভালো চায় এমন কেউ এতকাল শুধু শুধুই হাল্কা সঙ্গ দিয়ে এসেছে।

রাজী হয়ে গিয়েছিলাম। দ্বিধা করিনি। তারপরে ছবি তোলার কথা বলেছিল সাম। এমন ধরনের রিপোর্টিং ছবি সমেত ছাপা হলে তার গুরুত্ব বেড়ে যায় অনেক। মাইক্রো-ক্যামেরাটা দিয়েছিল, তালিম দিয়েছিল সেটাকে চালানোর জন্যে।

ক্যানস্পেণ্ড এনি এ্যামাউন্ট টু বাই নিউজ এ্যাণ্ড স্ন্যাপস্। দরকার হলে দু'হাতে খরচ করবে। মোট কথা, যা ঘটছে তার মাইনিউট এ্যাকাউন্ট চাই যথাসম্ভব। সুসি দেখা করবে সকালে। ক্যাশ যা দরকার মনে করবে নিয়ে নিতে পার ওর কাছ থেকে। তোমার বাড়ীতেই ও যাবে।

বুঝলাম, সাম ধরেই নিয়েছে আমি রাজী হয়ে যাব। না ধরার কোন কারণ নেই। যখন খবর বেচে দিন গুজরান করি, এমন একটা প্রস্তাব উড়িয়ে না দেওয়াই স্বাভাবিক আমার পক্ষে।

কথা শেষ করে যখন উঠলাম তখন সাড়ে বারোটা প্রায়। লিফ্‌ট্ দিতে চাইল সাম। বলল, যখন ওর জন্যেই এত দেরী, তখন পৌঁছে দেবার নৈতিক দায়িত্বটাও ওর। গেট আপ, সুসি।

ওর ক্যানবেরা-১২ গাড়ীখানায় উঠে ভাবছিলাম, সমস্ত ব্যাপারটা একটা স্বপ্ন কিনা:

একেবারে নিরালা নিশুতি শ্মশান নিস্তব্ধতা বুকে নিয়ে শহরের বড়ো রাস্তা থেকে অলিগলি যেন প্রতিমুহূর্তেই একটা বিস্ফোরণ বা অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কায় কুঁকড়ে রয়েছে। বছর দুই-তিন আগেকার মধ্যরাতে শহরের রাস্তাঘাট যেন ঘুমিয়ে পড়ত। শোনা যেত তাদের নিশ্চিন্ত শ্বাসপ্রশ্বাস। দামাল ছেলে ঘুমোলে তাকে কোলে নিয়ে জননী যে পরমতৃপ্তিতে সারাদিনের ক্লান্তি ঘুচিয়ে ঘুম দিত, তারই ছায়া পড়ত রাস্তাঘাটের অবয়বে। কিন্তু সময়ের অস্থিরতা হরণ করেছে সেই তৃপ্তি। কুকুরগুলো আর ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে ভরসা পায় না আজকাল রাতবিরেতে। শুধু ভবঘুরে আশ্রয়হারা রাস্তার মানুষগুলো এখানে সেখানে ছড়িয়ে শুয়ে আছে। ;অঘোরে ঘুমোচ্ছে। একালে বোধহয় একমাত্র ওরাই নিশ্চিন্ত।

সামের কথায় চমক ভাঙ্গল।

তোমাকে আর একবার সাবধান করে দিচ্ছি। ধরেই নাও, যদি জানতে পারে কেউ তুমি কভার করতে গেছ, তোমার জীবন বিপন্ন হবে। কাজেই কোন অজুহাতে তোমায় যেতে হবে সেখানে। কাজও সারতে হবে সবার অলক্ষ্যে। অবশ্য যেখানে মনে করবে গোপনীয়তা না রাখলে তোমার সুবিধা হবে, সেখানে পরিচয় দিতে পারবে।

তা কেমন করে সম্ভব হবে বুঝতে পারছি না।

এখন তা না বুঝলেও চলবে। এ্যাক্‌সেস্ করে নিতে হবে তোমাকে। কেমন করে করতে হবে তা তোমার ওপর নির্ভর করছে। তবে, আমাদের যা ইন্‌ফরমেশন তাতে ওপেন কভার চলবে না এক

পক্ষের কাছে। আর এক পক্ষ অবশ্য পাবলিসিটি চাইতে পারে। সুতরাং য়ু গেট হোল্ড অফ দা হোল।

আচ্ছা সাম, একটা কথা না বলে পারছি না।

বল।

এসব ব্যাপারে তোমার ইন্টারেস্ট আছে জানতাম না। যাইহোক, কভারটা নিজে করলেই তো পারতে।

এ কথা তোমার কাছে আশা করিনি। অন্ততঃ কিছুটা বুদ্ধির পরিচয় দেবে তো?

মানলাম। পরিচয় ঢাকতে পারবে না, গায়ের রঙটাই এক্‌স্‌পোজ করে দেবে, এই তো? তাহলে অন্য কাউকে।

দিতে পারছি না প্রাণ ধরে। শোন ডিয়ার ল্যাড, বিশ্বাস বলে একটা কথা আছে, শুনেছ সেটা আশা করি। আর তাছাড়াও, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের বাবদ কিছু করারও থাকা স্বাভাবিক আমার কাছে। ডোণ্ট উওরি! টেক্ ইট ইজি এ্যাণ্ড ফর স্পোর্টস্।

চুপ করে গেলাম। কোন পুরস্কার বা পাওনার কথা ভেবে বন্ধুত্ব করিনি, কেমন করে বুঝিয়ে বলি একথা? এমন অযাচিত দাক্ষিণ্য নিয়ে বন্ধুত্বকে নীরস পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল। কেন পারলাম না কে জানে! দুর্বলতা বা অক্ষমতা যাইহোক, একধরণের অনায়াস আত্মসমর্পণের আলস্য ভর করল আমায়।

আন্দাজ করতে চাইলাম, কেন খবরগুলো আমার মারফতেই চাই সামের। শুধুমাত্র কি সাংবাদিকতার আন্তর্জাতিক ব্যবসার খাতিরে? ফ্রী ওয়ার্লড ফ্রেণ্ডশীপ মিশনের কাজ কি এই এ্যাসাইনমেণ্ট দিয়ে যাওয়া?- যার আভাস দিল সুচিরা? বড় বড় বিজনেস ম্যাগনেট, হাই অফিসিয়াল, পলিটিসিয়ান্‌স্ এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার মিশন কোন ফ্রেণ্ডশীপ রক্ষা করছে জানি না। সহজ যুক্তি, সরল বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুর একটাই গূঢ় অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, মাত্র একটাই ব্যাখ্যা। মনশ্চক্ষে ফুটে উঠতে দেখলাম বিশ্ব-জোড়া ফাঁদ পাতা দুরন্ত ঝানু এক যন্ত্রজালের প্রেতচ্ছায়া। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ওশিয়ানিয়ার জনশূন্য ভূখণ্ড পর্যন্ত এই ছায়ার নৃত্য চলেছে তো চলেছেই। রাজা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি যাচ্ছে, প্রশাসক যাচ্ছে, স্ক্যাণ্ডালে গ্রাস করছে, হনন করছে কত উচ্চাভিলাষী রাজনীতিকের আখের। ভারতবর্ষেও এই ছায়া বারেবারে পড়তে চাইছে শুনেছি। জানি না পড়ছে কি না। এই এ্যাসাইনমেন্ট কি সেই ছায়ার কোন ভগ্নাংশ? নইলে কেমন করে অত খবর ওরা পায়? নিশ্চিত প্রত্যয়ে ইংরাজী বর্ণমালার তৃতীয়, নবম ও প্রথম অক্ষর আমার চেতনা ছুঁয়ে গেল।

তবুও দ্বিধা হল কোন কিছু বলতে। যা ভাবলাম তা তো সত্যি নাও হতে পারে। যতই হোক, মার্কিন সংবাদ জগতের বহু গোপন তথ্য পরিবেশনার কৃতিত্ব অস্বীকার করতে পারলাম না। এমনও তো হতে পারে, বহু গোপন চমকপ্রদ তথ্যের মত এ তথ্যও সে জগতের দরকার হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই কৌতূহল আর অভিনবত্বের একটা অনিবার্য টানও অনুভব করলাম।

ফ্ল্যাটবাড়ীর সামনে আমাকে নামিয়ে শুভরাত্রি আর বিদায় জানাল সাম। ফোম কুশনের মত নরম হাতে সুচিরা আমার একটা হাত নিয়ে উষ্ণতার আবেশ ছুঁইয়ে গেল। তারপরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখলাম কখন ক্যানবেরা-১২ গাড়ীটার ব্যাকলাইট মিলিয়ে গেল বাঁকে বাঁকে।

ঘরে গিয়ে ভাবতে বসলাম আবার। রমজমে গ্রাণ্ড। রাজকীয় পরিবেশের পিছল সিঁড়ি, প্রায়-দোতলার বারান্দা, আর আধা-লাউঞ্জের সেই আর্ট গ্যালারী। দেয়ালে-দেয়ালে ফ্রেসকো, প্যানেলে বাঁধানো আর্ট কালেকসান, প্লেন্টিং, সংক্ষিপ্ত মোটিফ আর রিলিফ মাঝে মাঝে। সেসবের মধ্যে সৌখীন এনক্লোজার সানমাইকা বা ডেকরেটিভ ল্যামিনেটেড ইনসুলেশানে ঘেরা। চারদিক মসৃণ,—

কেমন যেন হঠাৎ পিছলে যাওয়া ভাব ঘিরে ধরে চারদিক থেকে। বাহারী লিনোলিয়ামের রঙের জেল্লা থমকে দেয় পদক্ষেপ, প্রতিক্ষণেই যেন কেউ পা ধরে টান দেয় উল্টে ফেলে দেবার পরিহাসে।

এমন জগতে ক্ষণিকের পান্থ আমরা, নেহাৎই ক্ষণিকের। বিশ্রাম নয়, অবসর বিনোদন নয়, শুধু কেতা বজায় রাখার তাগিদেই সেখানে আমাদের সোজোর্ন কিংবা উচ্ছিষ্টাভিলাষী কাকের মত আবির্ভাব।

তাই, এর সমস্তটাই হতে পারে স্বপ্ন, সান্ধ্যস্বপ্ন। আর সুচিরার কবোষ্ণ সান্নিধ্য?

তখন ঘুরছে মাথার মধ্যে, ঐ যে রঙীন মদিরা, যা সিপ্ করলাম তার তো চোখে মনে স্বপ্ন ধরানোর স্বধর্ম আছে।...সাম ওয়েন, নিউ জার্সির যুবক জম্বুদ্বীপে সেদিনকার প্রবাসী—সে যা শোনাল তা কি বিশ্বাস করবার মত?

শুধুমাত্র পেশার তাড়নায় নয়,—সহজ স্বাভাবিক কৌতূহলে, এই শহরকে দেখার চোখে, বোঝার চেতনায়, জানার আগ্রহে উল্টে-পাল্টে ফেলছি কত বছর? প্রায় ত্রিশ। তবুও যে খবর, যে অঘোষিত বিসংবাদ হায়দ্রাবাদ ঘুরে ফের শহরেই ফিরে এল তা জানলাম না কেন? তবে কি পেছিয়ে গেছি একাল থেকে?

রাতে বিছানা নেবার আগে অবধি বুঝতে পারিনি সামের কথায় কী করতে এগিয়েছি, কোন দায় কাঁধে তুলে নিয়েছি।

সকাল হতে না হতেই ফোন এল। নীচের ফ্ল্যাটের ফোনেই আমার সব দূরভাষ যোগাযোগ। আগের রাতের ঈষৎ বিষণ্ণ হ্যাং-ওভারের রেশ নিয়েই ফোন ধরলাম।

হ্যাল্লো, সুচিরা বলছি। ঘুম ভেঙেছে?

ঘুমটা ভাঙালে!

হাউ স্ট্রেঞ্জ! আচ্ছা ক্যালাস লোক তো তুমি! বকুনি সুরের অভিযোগটা ভারী অন্তরঙ্গ।

কম্‌প্লিমেন্ট্‌টা ভালই দিলে সকালবেলা।

কিছু মনে করো না, সরি। আমার একটা লোক তোমার কাছে যাচ্ছে। আমি যেতে পারছি না, একটু আটকে গেছি। লোকটা একটা ফোল্ডার দেবে তোমায়। সেটা নিয়ে নিও।

কী ব্যাপার ?

ব্যাপার আবার কী ? জানো না বুঝি, না ভুলে গেছ ?

কী বল তো ? ন্যাকা সাজতে চাইলাম।

কিছু না। যা বলছি করবে, ব্যাস্‌। ছেড়ে দিচ্ছি। মোটেই সময় নেই। পরে দেখা হবে, কেমন ?

ফোন ছেড়ে দিল সুচিরা। আগের দিনের কথাবার্তা যে কতটা বাস্তব ছিল, এবার বুঝতে পারলাম। ফিরতে ফিরতে মনে পড়ল মুরারির কথা। স্কুলজীবনের বন্ধু। থাকতাম পাশাপাশি পাড়ায়। তারপর যে যার প্রয়োজনে শহরেরই এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত ছিটকে ছিটকে বেড়িয়েছি। ওরা যেখানে চলে গেল শেষ অবধি সেই মহল্লাতেই বাড়ী করেছে ও। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ঠিকাদারী করে। কিন্তু এককালে খুব নামডাকওয়ালা হয়ে গেছল ও। পাড়া বা আশপাশে এক ডাকে চিনত ওকে সবাই। ঐ এলাকায় ইদানীংকার এত ঝামেলা গণ্ডগোলের মধ্যে আঁচড়টি লাগেনি কখনো ওর গায়ে। ম্যানেজ করার একটা নিজস্ব কায়দা আছে ওর। সেই ধরনের লোক মুরারি, যারা দিব্যি গা বাঁচিয়ে সবরকম হুজ্জুৎ পাশ কাটিয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। আগুন-লাগা বাড়ীর লাগোয়া বাস করেও আগুনের আঁচ লাগেনি ওর স্বচ্ছল সংসারজীবনে।

তখনি ঠিক করেছিলাম, এ যাত্রায় মুরারিই হবে একমাত্র অবলম্বন। তবে, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আসল মতলব ওর কাছে ফাঁস করলে হয়তো উড়িয়ে দেবে। সোজা বলবে, শালা আচ্ছা ব্যবসাদারী ধরেছিস্‌। মানুষে কামড়াকামড়ি করে মরছে আর তাই নিয়ে ফিরি করবি ? হয়তো সোজা পথ দেখতে বলবে।

কাজেই, একটা কৌশলেব কথাও ভেবে নিয়েছিলাম। আর সেই কৌশলেই মুবাবিকে পাঠিয়েছি খবব নিতে, দেখার ব্যবস্থা কবতে।

বেশ কিছুক্ষণ পবে মুবাবি ফিবেছিল। ঘবে ঢুকে এমনভাবে বসে পড়ল যে দেখেই বুঝলাম, হাল ছেড়ে দিয়েছে। তাবপবে ফোঁস কবে একটা নিশ্বাস ফেলে আড়চোখে চাইল আমাব দিকে।

এখানে আসাব আগেই ঠিক কবে নিয়েছিলাম, এই কভাবে জট্ ডাউন কবব সব। আন্তর্জাতিক মানেব সংবাদ সংগ্রহ। খুঁটিনাটি লিখে নিতে হবে। পুবানো ডায়েবীব কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে এনেছি। কাজে লাগাব সেগুলো, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপাবও বাদ দেব না। সব সাবা হলে, তখন বাছাই কবে ফাইন্যাল কবব। ফাঁক পেয়েছিলাম। লিখে ফেলেছি দু-চাব কথা। মুবাবি ফেবাব আগেই হাতব্যাগটাব হাডবোড লাইনিং-এব ভাঁজে কয়েকটা ভর্তি পাতা বেখে দিয়েছি। তারপবে তখনকাব একমাত্র চিন্তাব গভীবে ডুবে চেয়েছিলাম লক্ষ্যহীন ভাবে।

একটু কাশল মুবাবি। সম্ভবতঃ আমাব মনোযোগ আকর্ষণ কবতে চাইল। ফিবে তাকালাম ওব দিকে।

মানে,—বুঝলি, একটা ইয়ে হয়েছে

কী?

এই, মুশকিল হয়েছে কী

কথা বলতে যেন বাধো বাধো ঠেকছে ওব। কোন কথা না বলেই ওব মুখেব দিকে জিজ্ঞাসাব দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে বইলাম। এই নীববতাব একটা অর্থই কববে ও। ভাববে, বৌদিব ভায়েব দুর্ভাবনায় মনমরা হয়ে আছি আমি। প্রতিমুহূর্তেই প্রতীক্ষা কবছি কোন দুঃসংবাদেব।

বলতে লজ্জা কবছে তোকে, হোল্ সিচুয়েশান আউট অফ

কনট্রোল বলতে পারিস। কিছু করার নেই। যাওয়া যাবে না কোথাও। অবশ্য একটা চেষ্টা করে দেখেছি, কী যে হবে ঠিক নেই। ধৈর্য্য ধরতে হবে একটু।

কিন্তু ব্যাপারটায় ধৈর্য ধরার কোন সুযোগ নেই, 'বুঝতে পারছিস তো মুরারি। গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যে একটু উদাসভাবেই বললাম কথাগুলো।

বুঝতে পারছি। তবে দেখ, কোন উপায়ও তো নেই। আজ চুপচাপ থাকতে হবে।

তা না হয় থাকলাম। কিন্তু কাল সকালে কি বেরোনো যাবে খোঁজখবর নেবার জন্যে ?

দেখি, কী হয়। খবর দিয়েছি একজনকে। আমাদের আগেকার গ্রুপে জুনিয়ার ছিল। ইদানীং একটু টপ্ হয়েছিল। জানি, ও এই এ্যাকশানে আছে। রাতেই দেখা করতে বলেছি আমার সঙ্গে।

সে কি আসবে ?

খবরটা যদি পায়, আসবেই।

আসার নিশ্চয়তা নেই। খববটা যদি না পায়।

পাওয়া উচিত। তবে মিস্ করলে আবার সকালেই ওকে ডেকে পাঠাব।

একই ব্যাপার তো হতে পারে সকালে ? খারাপটাই ধরা যাক। তাহলে ?'

অলটারনেটিভ্ কিছু ভাববো তখন।

সংক্ষেপে ইতি করে দিল মুরারি। সুতরাং কিছু করার নেই আপাততঃ। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম, পথের সন্ধান করার জন্যে। অপেক্ষা করতেই হবে। ঘটনাগুলো দুরন্ত বেগে ঘটে গেলেও করার নেই কিছু। হয়তো অনেক অনেক ব্যাপার শেষ হয়ে যাবে এই একটা রাতের মধ্যে। কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কারাই বা এই ভয়াবহ উৎসবের শরিক হয়ে নিষ্ঠুরতার পাল্লা দিয়ে চলেছে ?

ব্যাপারটা কী হয়েছে জানিস্? ভাবনাগুলোকে থমকে দিল মুরারি।

আমার জানতে-চাওয়া চাউনির সঙ্গে নজর মিলিয়ে বলল মুরারি :

কেন এসব হচ্ছে, ভাবছিস্ নিশ্চয়।

তা তো ভাববোই।

হচ্ছে, কারণ ডালুদা'র মার্ডার। ওটা যদি ওরা না করত তাহলে এই কাণ্ড হত না।

বুঝতে পারলাম না। অবশ্য বোঝার দরকারও নেই। ডালুদা কে আর কাণ্ডটাই বা কী?

ডালুদাকে চিনিস্ না? মিলন চৌধুরী, আমাদের এই এরিয়ার লীডার। যাকে খুন করল ওরা। তার বদলা হচ্ছে এখন। একেবারে একতরফা বদলা। মারের চোটে –

কারা খুন করল?

বুঝলি না? যাদের একটা ছোড়াকে খুঁজতে এসেছিস্ তুই।

কেন খুন হলেন ভদ্রলোক?

তা ওরাই জানে। কাগজে পড়িস্নি মার্ডারটার কথা?

হয়তো দেখেছিলাম। মনে নেই।

এই তো দু'দিন আগেই ঘটে গেল ব্যাপারটা।

এমন ব্যাপার তো হামেশাই ঘটছে। কে কাকে কেন কী জন্যে খুন করছে বোঝা যায় না। জানা সম্ভব নয়। কোনটার কী গুরুত্ব দূরের লোকেরা তা বুঝতেও পারে না।

তা ঠিক। তোরাই বা বুঝবি কী করে এখানে ডালু চৌধুরী খুন হলে তার পরিণাম কী হতে পারে। যদি শুনিস্, বুঝবি কেন এত হেল্পলেশ হয়ে গেছি এই ব্যাপারে। একটা পপুলার লোককে কেউ মেরে ফেললে তার বদলা হয় এমনিভাবে। অবস্থা কনট্রোল করা যায় না। নইলে কী আর তোকে এই পাশের পাড়াটা ঘুরিয়ে আনতে পারতাম না!

নিশ্চয়ই তোর উপায় নেই, এটা বুঝি।

তোকে বলব ব্যাপারটা, তাহলে তুই ঠিক ধরতে পারবি কী দাঁড়িয়েছে অবস্থা। তা এক কাজ কর। এক্ষুণি তো আর করা যাচ্ছে না কিছু—যাকে ডেকেছি, আসতে তার অনেক রাত্তির হওয়া স্বাভাবিক। জামা-টামা ছেড়ে ফ্রেস্ হয়ে নে। তোর খাবার কথা বলে আসি ছোড়াটাকে।

উঠে চলে গেল মুরারি। তবে ভাবনার খোরাক দিয়ে গেল কিছু। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবতে হল আমাকে। তাহলে দু'দিন আগেকার একটিমাত্র হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া এসব ?

চোখের সামনে যে নিষ্ঠুরতা, বীভৎস হত্যালীলা দেখলাম বিকেল থেকে, তা কি ঐ হত্যাকাণ্ডের জের ? যাই হোক না কেন, এ সবই বাস্তব সত্য, এর থেকেও ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক আরও অনেক কিছু ঘটছে, যা দেখতে পারছি না তাও তো বাস্তব সত্য। একের আর্তি, অপরের উল্লাস এ তো সেই কোন যুগ থেকে সুরু হয়েছে। প্রাক্-ইতিহাসের কাল, ইতিহাসের শতকগুলো এবং আর যা ইতিহাস হতে চলেছে সব কিছুতেই সেই একই ঘটনার রকমফের।

এ যুগের বিজ্ঞানের অগ্রগতি, চাঁদবিজয়ের সগৌরব অক্ষয়-কীর্তির পাশাপাশিও চলেছে সেই একই মানুষ শিকারের নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন। দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত অবধি এর অপ্রতিহত গতি। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে পর্তুগীজ আঙ্গোলা, দক্ষিণ আফ্রিকা-রোডেশিয়া হয়ে ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া পর্যন্ত আকাশে-বাতাসে-মাটিতে বেনিয়া স্বার্থের নরমেধ। এশিয়া-আফ্রিকার রক্তে স্ফীত ইয়োরোপই পরে পেয়ে এসেছে চিরকাল।

এসবই বোঝা যায়,—ব্যাখ্যার,আলোচনার চৌহদ্দির মধ্যে ধরা পড়ে।

কিন্তু এই নরমেধের কোন উপলক্ষ্য ? রাজনৈতিক মতভেদ ? শ্রেণীসংগ্রামের চমকপ্রদ রূপ আর রূপান্তরের হিসাবনিকাশ ? এই

যদি যুক্তি হয়, তাহলে ভিনদেশী ব্যবসায়িক স্বার্থের নররক্তপিপাসাকে দোষ দিয়ে লাভ কী? এক পাপে সবাই পাপী, সেই আদিম অপরাধে কালের কাঠগড়ায় সকলেই আসামী। অপরাধ এক—শুধু প্রকারভেদ মাত্র স্বার্থের, —ব্যবসায়িক আর রাজনৈতিক একদল শোষণের স্বার্থে নিরক্ত করে মানুষকে আর তেমনি করেই খুন করে, আর একদল দলীয় প্রভুত্বের জন্যে চালায় হত্যার তাণ্ডব। মানুষ বাদ যায় না কারো কাছে—সে এই দু'দলেরই নিরঙ্কুশ শিকার।

অনেক কথাই এমনি মনে এসে যায়। কোন দরকার নেই তবুও।

এরই মাঝে কখন ঘরোয়া হয়ে গেছি খেয়াল নেই। মুরারিও এসে গেছে। ওর আসার জন্যেই ছিঁড়ে গেল এলোমেলো ভাবনার সব সূত্রগুলো।

আমাকে দেখেই হয়ত বুঝল ও, গল্প শোনার মেজাজে নেই আমি। নিশ্চিত হতে চাইল, মনের দিক থেকে ওর গল্প গ্রহণ করার জন্যে আমি তৈরী কিনা। তাই বাজিয়ে নিল।

রেডি তো? মন দিয়ে শুনবি কিন্তু। যদি দেখি আনমনা হয়েছিস্, তাহলে কিন্তু আর বলব না।

রেডি আছি. বল্ তুই।

বলব। কিন্তু কথা দে', এসব নিয়ে আবার কাগজে-ফাগজে মশলাদার গালগল্প ছেড়ে বসবি না। খবরদার।

না রে না।

'টিস্যু কাগজটা পাকিয়ে থুতু লাগিয়ে নিল মুরারি। তারপরে দেশলাই কাঠি দিয়ে দু' প্রান্তের অসমান মিক্‌স্চার ঠাসতে ঠাসতে একটু ভূমিকা ফেঁদে বসল।

এত কথা বলতাম না তোকে, কেন বলছি জানিস্?

কেন?

বলছি এজন্যে যে, শুনে তোর মনটাই ঘুরে যাবে।

তাতে আর কি আসবে যাবে?

যাবে বৈ কি! দেশলাই জ্বেলে পাকানো সিগারেটটা ধরিয়ে বলল ও, যে ছেলেটার খোঁজে এতখানি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এসে পড়েছিস্ তুই, লাইফ রিস্ক করেও ঘুরে দেখতে চাইছিস, তার জন্যে একটুও সিম্প্যাথি হবে না তোর আমার কথা শোনার পরে। বরং রাগ হবে। বলবি, উচিত শিক্ষা হচ্ছে। হওয়া দরকার।

দেখ্, মুরারি, কোন বায়াস্ নেই আমার। শুধু ছেলেটা—

বড় ভালো, তাই বলছিস্ তো? আর সবাই বলে। ওরা নাকি সকলে ভালো ছেলে। কিন্তু ভালো ছেলের আগুন নিয়ে খেলা করাটাও কি ভালো? তার জন্যে তো হাত পুড়বেই কোন না কোন সময়ে।

বেশ টেম্পো নিয়ে সাফ কথা শুনিয়ে দিল মুরারি। পরক্ষণেই বোধহয় খেয়াল হল ওর। সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলল, তোর আত্মীয়, তার জন্যে আমারও ফীলিংস্ আছে। যা বললাম, নেহাৎ কথার কথা।

ইচ্ছে হল মুখ ফুটে বলি, আর না ঝুলিয়ে রেখে স্থুরু কর্ না বাপু। কিন্তু তার আগেই ও বলল ঃ

বড্ড বেশি ভ্যানতাড়া করছি। তা হোক। কী-ই বা করব? লোক জুটলে না হয় ফ্ল্যাশে বসা যেত। বলে নিবন্ত পাকানো সিগারেটটা টানতে লাগল ও চোয়ালের হাড় বের করে। সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি—তীর্থের কাক, ভাগাড়ের শকুন কিংবা পাতের পাশে হত্যা দেওয়া বিড়ালের মত। কখন আরম্ভ করবে তারই অপেক্ষা।

স্থুরু করল মুরারি।

ওর জবানীতেই শোনা কথাগুলো যতদূর মনে পড়েছে লিখে ফেলেছি এক ফাঁকে। ঠিক ওর মত করে হয়তো বা লেখা হয়নি, আমার ধারায় চলে এসেছে ওর ভূমিকা। তবে কোথাও রঙের ছিটেফোঁটাও লাগাইনি, এটুকু বলতে পারি।

ঠিক দু-দিন আগে, যেদিন বিকেলে অঘটন ঘটল—সেদিনই সকালে ফিরছি বাজার করে', ক'টা হবে তখন? ন'টা কিংবা সাড়ে ন'টা বড়জোর, ডালুদার মোটরবাইকটা পেছন থেকে এসে আমার পাশাপাশি ব্রেক কষল।

চ', বাড়ী পৌঁছে দি' তোকে।

একেবারে খাদের গলায় ডালুদার কথাগুলো অস্বাভাবিক লাগল।

থাক্ না। এই তো এসে গেছি। হেঁটেই চলে যাব।

যা বলছি শোন্। উঠে পড়্।

ওর কথা উড়িয়ে দেয় হেন লোক জন্মায়নি এ চত্বরে। বিশেষ করে আমাদের তো কথাই নেই। কারণ বহু বছর থেকে ওর সঙ্গে হাজারো বাঁধনে বাধা আমরা।

আমায় নিয়ে এসে বাইকটা টেনে সিঁড়ির তলায় রেখে দোতলার একটা ঘরে উঠে এল। চেঁচিয়ে বলল, চট্ করে একটু আয় তো ফণ্টে।

বুঝলাম কোন ব্যাপার আছে। বাজার জায়গামত জমা দিয়ে হড়বড় করে উঠে এলাম।

চুপচাপ বসে আছে ডালু। ওর চোখে-মুখে কেমন একটা অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য। দরজার দিকে আমার আসার পথ চেয়ে রয়েছে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে।

চা খাবে?

না! চা খেতে আসিনি। বোস্।

সামনাসামনি বসলাম। ভ্রূ কুঁচকে ওপর দিকে উঠে গেছে ওর। এমনভাবে সচরাচর দেখা যায় না ওকে।

শালা কী হল বল তো! দিন-কে-দিন হচ্ছে কী? মরে গেছি নাকি আমরা?

কী হয়েছে?

বটতলায় নারানের সেলুনে দাড়ি কামাতে গেছি, যেমন একদিন অন্তর যাই। চেয়ারে বসেছি, আয়না দিয়ে দেখি—

থমকে গেল ডালুদা।

কী দেখলে ?

চোখোচোখি চাইল ও। অবাক হয়ে দেখলাম, একটা ভয়, একটা সন্ত্রাস যেন ঝিলিক মারছে ওর চোখে। কেমন শুকিয়ে গেছে মুখখানা।

ডালু চৌধুরী ভয় পাবে শুনলেও হাসি আসে। ওর তাগৎ আর হিম্মৎ যে কত, আমাদের থেকে বেশি করে আর কেউ জানে না! পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি গুলিবাজী করছে এককালে পার্টি গ্রুপের সঙ্গে স্টেনের লড়াই করেছে। বেপাড়া থেকে যাকে তুলে আনার ইচ্ছে করেছে তুলে এনেছে গিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা মালদার লোকের বদমায়েসি ঢিট করে দিয়েছে। মেয়েদের পিছু লাগা উঠতি মাস্তানদের চুলের ঝুঁটি ধরে মাথা ঠুকে নাকে খৎ দিইয়েছে। কস্মিনকালে কোন কিছুতেই পরোয়া করত না ও।

কয়েক বছর ঐ সব ছেড়ে দিয়েছে। সংসারী হয়েছে। চাকরী করছে কাছাকাছি পেপার মিলে। কিন্তু দলের ধারা পালটে দিয়েছে ও। একটা সংঘ নিয়ে মেতে থাকে। বারোয়ারী পুজো-আচ্চা, ফাংশান এসব ছাড়াও সংঘের ছেলেদের জন্যে করেছে একসাইজ ক্লাব, ফুটবল টিম এই সব। এখনও ওর ডাকে কয়েকশো ছেলে বেরিয়ে আসবে জান কবুল করতে। ছোট বড় সবাই মানে ওঁকে। কারোর বিপদে-আপদে বুক দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। কারো চিকিৎসা হচ্ছে না, তার হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা, কন্যাদায়-পিতৃদায়-মাতৃদায় যাই জানাক না কেউ, ডালু জান লড়িয়ে উদ্ধার করে দেবে তাকে। কোন কিছুর পরোয়া করবে না।

সেই ডালু ভয় পেয়েছে। কেন ?

কী হয়েছে বল না—তাড়া দিলাম ওকে।

দেখলাম, আয়না দিয়ে চোখে পড়ল—

কোথায় যেন হোঁচট খাচ্ছে ও। একটু থমকেই আবার বলল, ব্যাপারটা বোধহয় তেমন কিছু না, বুঝলি। থাকগে ও আর বলে কাজ নেই। বরং চলি এখন--

কিন্তু বললে না কিছু।

আরে ধ্যাৎ, ও সব না বলাই ভালো। হেসে উড়িয়ে দিবি। ভাববি আমিও শালা ফেমিনাইন মেরে গেছি।

জোর করে হাসল ডালুদা। যেন ও অরিজিন্যাল সেই কুছ-পরোয়া ভাব আনতে চাইল।

সত্যি ঘাবড়ে গেছিলে, না ফল্স্ দিলে একটা?

ফল্স্ ফল্স্! তবে কি জানিস্, শালা কখন কোন তালে যে একটা উইক মোমেন্ট ঘাড়ে চেপে বসে। সেটা কেটে গেছে। ফর্মে ঘুরে এসেছি আবার।

খুব স্পষ্ট, কোন ঘটনা ঘটে গেছে। বলতে চায় না ও। শুধুই কি নার্ভাস হয়েছিল? ছাড়লাম না ওকে।

কী দেখলে আয়না দিয়ে সেইটাই বল না। শুনে রাখি।

লে ব্বাবা, আর অত শোনে না। কীই বা হবে ওসব খচ্‌খচানি শুনে?

উঠে পড়ল ও। বুঝেছি ঘটনাটা জানা দরকার। ওকে চাপতে দিলে ঠিক হবে না। সাধারণ কোন ঘটনা বা তুচ্ছ করার মত নয় কিছু। যখন মনে মনে এতটা আপসেট হয়েছে ও।

হাতটা চেপে ধরে টেনে বসালাম ওকে। গলাটা ভেজা-ভেজা করে বললাম:

চেপে যাচ্ছ মাইরি নির্ঘাৎ। লাইন ছেড়েছি অনেকদিন। তবুও তুমি ওস্তাদ, গুরু। ভাবছ, ফুটে গিয়ে তোমার কোন ধার ধারব না? অতটা নেমকহারাম ঠাউরেছ আমাকে? কী কারবারটা হয়েছে বলতে হবে তোমায়। যখন একটু আঁচ দিয়েছ, ছাড়ছি না। বলতে হবে।

সাফ কথায় খানিক টলে গেলেও ওর কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা হল। হাল্কা গলায় বলল ঃ

ফক্টে, শালা রোয়াবি ঝাঁকাচ্ছিস্, এ্যাঁ ? ভাবছিস্, ডেলো মিইয়ে গেছে ? ও হারামীর বাচ্চারা খোকা হাঁকড়েছিল আজ। আয়না দিয়ে দেখি, রাস্তার ওপার থেকে এক খানকির ছেলে খোকা তুলেছে আমার মাথা তাগ করে। ঠিক সেই সময়ে পড়বি তো পড়, একটা ভ্যান থেমে গেল রাস্তায়।

তারপর ? রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম।

তারপর আর কী? উঠে গার্ড নিলাম। নারাণকে বলতেই দরজা আটকে দিল।

আজকাল তুমি কি সঙ্গে রাখ না কিছু ?

রাখি বৈকি! আলবাৎ রাখি। কিন্তু আজ সঙ্গে ছিল না। দাড়ি কামাতে যাব তার জন্যে আবার ঘোড়া নোব ?

তারপরে কী করলে ?

নারাণকে বললাম, ওর সেই ছোড়াটাকে দিয়ে দেশোকে ডেকে দিতে। দেশো এসে সব শুনে তো মহাখাপ্পা! আমাকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসো তো গুরু দেখি কোন শালার বাচ্চা কী করে।

বাইরে বেরোলে ?

অত পেঁচো ভাবলি আমায় ? দেশোকে বললাম, দাশু ভালো চাও তো দেখ বুকের পাটা অত চিতিয়েছে কার। আমি দাড়ি কামাচ্ছি। নারাণকে দরজা সাঁটতে বলে কাজ সেরে নিচ্ছি, একটা ছোঁড়াকে কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল দেশো। আমার সামনেই ঝাপ্পড় হাঁকালে। বললে, এ শালা উচ্চিংড়ে বেপাড়ার রঙরুট। বিরলের কব্জায় পাড়ায় ঢুকেছে। শালা খেলনা খোকায় তালিম নিচ্ছে।

বিরল আর তার দলবলকে তো এই কাল থানা থেকে ছাড়িয়ে আনলে তুমি শুনলাম।

তা এনেছি। না এনে কী করি বল? এক পার্টি কব্জা করতে গেলে আর এক পার্টি হাত করতেই হবে। কাঁটা ওপড়াতে চিমটে লাগে।

কিন্তু ওদেরও মতিগতি ভালো নয়।

কাদের?

ঐ তোমার বিরলদের।

কেন?

তোমাকেও ছেড়ে কথা কইবে না ওরা তাল পেলে।

আরে না না। ওদেরও তো আমাকে দরকার। ওরাও চায় ঐ পার্টি খতম করতে। আমার মদত ছাড়া তা পারবে ওরা এখানে?

যাই হোক, তুমি ওদের বেশি পাত্তা দিও না।

চুপ করে গেল ডালুদা। একটু ভেবে নিয়ে বলল:

দেশো ওদের খুব ঠেসেছে। বলেছে, এখন পার্টি করি আর যাই করি—গুরুর গায়ে আঁচড়টি লাগলে গুণে গুণে লাশ ফেলব। গুরু না থাকলে ঐ ওদের ধোলাই খেয়ে কবে পাত্তা ফুটে যেত। খোঁচড়দের ডাণ্ডাবাজি ও পিসে পার্টিফার্টি কবে লাটে উঠিয়ে দিত। সব করব, নেমকহারামি করব না, করতে দোব না।

দেশোর কথায় বিশ্বাস কর তুমি? আর ওর কথায় তা আর ওদের দল চলবে না।

ওর ওপর অনেকটা নির্ভর করে, জানিস তো?

তা জানি। ওর দলবলটাও বড় কম নয়। তবুও।

বিরলেকে খবর দিয়েছি বিকেলে ফেরার পথে যেন দেখা করে।

থাক। দেখা করো না। দিন কয়েক যাক্, তারপর।

তুই ভাবছিস কী বল তো? আমি কি মরে গেছি না আর মরদামা নেই?

সব আছ। বোঝও সব। তবু গোঁয়ার্তুমি করো না গুরু! ন্যাপা, গুলে, নিমাই এদের সঙ্গে রেখে ঘুরো কিছুদিন। বলা যায় না।

যা বে যা! ওসব ভয় আমি করি না বুঝলি! যা হবার হবে তুই-আমি তার কী করব রে? গুলি মার। দেরী হয়ে গেল, আমি এখন উঠি।

উঠে পড়ল ও। আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসল, পিঠে চাপড় মেরে বলল: জিতা রহো বেটা। ঘাবড়াও মাৎ।

তারপরে তরতরিয়ে নেমে চলে গেল। যাবার সময়ে চেঁচিয়ে ছেলেমেয়েদের ডেকে গেল। বৌকে বলল, একদিন ইলিশ কেনাও। ভালো করে রেঁধো। খবর পেলে খেয়ে যাব।

বাইরে ওর বাইক ছাড়ার আওয়াজ পেলাম একটু পরেই। কেমন যেন বোমভোলা মেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা মুণ্ডু ভাবছি। কী করা যায়? কোনভাবে কিছুদিনের মত যদি লোকটাকে সরিয়ে দেওয়া যায় অন্য কোথাও। ডালু বুঝছে না, যুগ পাল্টেছে, মানুষের মধ্যে হারামীপনা বেড়েছে। এই চত্বরের আশেপাশে পরের পর যেভাবে কাবার হচ্ছে লোকগুলো, তাতে কখন যে কী হয়ে যায় বিশ্বাস নেই। এই তো একদিন আগে সকাল দশটায় এ পাড়ার ললিতবাবুকে বাসস্ট্যাণ্ডের কাছেই গলা কেটে খতম করল। তিনি পুলিশে চাকরি করতেন ঠিক, কিন্তু ভারী মিশুক আর পপুলার লোক ছিলেন। ঐ দুটো পাড়া শক্ত ঘাঁটি ওদের--বটতলা আর কলুপাড়া। পুলিশ ঢুকতে ভয় পায়। কতগুলো কনস্টেবল আর পুলিশ অফিসারকে যে ঐ এলাকায় আর তার আশেপাশে খতম বা জখম করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

কাজেই ডালুর বিপদ ঘনিয়েছে বুঝতে পেরেছি তখন। ওর দলের চাঁইদের খবর দিতেই হবে।

আমারও আবার সেদিন খুব কাজের ঝামেলা। অন্ততঃ চার-

চারটে জায়গায় টেণ্ডার দিতে হবে। অনেক অনেক টাকার কাজ। বেরোতেও হবে তাড়াতাড়ি। নিজের অফিস থেকে কাগজপত্র নিয়ে শহরের চারটে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বেলা একটার মধ্যে জমা দিতে হবে কোটেশান। বছর-চারেক আগে থেকেই কাজকর্মে মন্দা চলছে। একেবারে নিরম্বু উপোস বলতে গেলে। চারটে কাজের একটা অন্তত: ম্যানেজ করতেই হবে। নইলে অবস্থা কাহিল। টান পড়ে যাচ্ছে পুঁজিতে।

ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে দশটা বাজে। দেরী করা যায় না মোটেই। ডালুর খিট্‌কেলটাও মনের মধ্যে খোঁচা দিচ্ছে।

তড়িঘড়ি স্নান-খাওয়া সারলাম। কিন্তু খালি খালি চোখের সামনে ভাসছিল ললিতবাবুর গলাকাটা লাশটা। অনেক চেষ্টা করেও তা চাপা দিতে পারছিলাম না।

ডালুর বৌ পুতুলকে বলব মনে হল একবার। আর পাঁচজন মেয়ের মত ভয়-তরাসে নয় ও। তবুও হাজার হোক এমন সম্ভাবনার খবরটা ওকে দেওয়া ঠিক হবে ভাবতে পারলাম না। যতই মনের জোর আর সাহস থাক না কেন এমন ব্যাপারে কোন পুরুষই ডাঁটো থাকতে পারবে না, মেয়েরা তো দূরের কথা।

বেরিয়ে নেপা, গুলে, কাবুলদের খোঁজ করলাম ওদের আড্ডায়। এমন সময়ে পাওয়া যায় না ওদের ওখানে। পেলামও না। ওদের মধ্যে সবাই প্রায় টুক্‌টাক কিছু না কিছু করছে। এক সকাল ন'টা অবধি আর এক সাড়ে পাঁচটার পরে দেখা মিলতে পারে ওদের। সবাইকে বলা যায় না একথা। তেমন বিশ্বাসী পেলাম না কাউকে— যাকে আভাস দিয়ে যেতে পারি টিপিটিপি।

ছটফট করতে করতে নিজের কাজের ধান্দায় ট্যাক্সি নিয়ে দৌড়োলাম অফিসের দিকে। চট্‌পট্ কাগজপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়েছি আবার সেখান থেকে।

প্রথমে যেখানে টেণ্ডার দিলাম, তার পাশের পাবলিক কল-এর সামনে ট্যাক্সি ওয়েটিং রেখে ডালুর অফিসে ফোন করলাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর ভরাটি দরাজ গলা শুনলাম।

মুরারি ?

হ্যাঁ, বল।

কথাগুলো আটকে যাচ্ছিল। গলা ঝেড়ে সাফ করে নিয়ে আমতা-আমতা করে বললাম : ওদের বলে এসেছ ?

কাদের ? কী বলব ?

মরিয়া হয়েই বললাম, ঐ নেপাদের। সকালের ব্যাপারটা।

অট্টহাসি শোনা গেল ওর। খেপেছিস্ ? খামোকা ওদের তাতিয়ে লাভ কী ? ও সব মাথা গরম। কী এ্যাকশান ছুটিয়ে যে বসবে, কে জানে ?

ও! কথা বন্ধ হয়ে এল প্রায় আমার। কোনমতে বললাম, তাহলে কখন বেরোচ্ছ তুমি ? কেন ? আসবি নাকি তুই ? তরল হয়ে এল গলাটা। হুত চলে এখনো তোর ? পাগলামো রাখ। ওসব কিছু নয়, চ্যাংড়াদের ব্যাপার। ভড়কি দিয়েছে স্রেফ। আসার পথে ওদের ক'জনের সঙ্গে দেখা। বললে, কিছু মনে করো না গুরু। আজ তোমার বাড়ী ফেরা নেই। এখানেই রেখে দোব তোমায়। খাওয়া-দাওয়া আছে। দম্‌ভোর খেতে হবে।

চমকে উঠলাম। কথাগুলোর অন্য মানে নেই তো ? ওদিকে বলে চলেছে ও, বললি তো গিয়ে কাজ নেই আর। না কি রে ?

বললে কি আর শুনবে তুমি ? কিছুদিন বরং ছুটি নিয়ে বাইরে কাটিয়ে এস। আর আজ একা ফিরো না ক'টায় ছুটি তোমার ?

কোম্পানীর ছুটি তো ছ'টায়। জানিস্ না ?

তুমি তো ইচ্ছেমত কাটতে পার। ক'টায় বেরোচ্ছ আজ ?

সাড়ে চারটে নাগাদ। পুতুলকে নিয়ে আবার যেতে হবে ওব মামার বাড়ী।

তা হোক, তুমি ফোনে কাউকে ডাকিয়ে নাও। অন্ততঃ ক্লাবে খবর দিয়ে জনাকুড়ি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ফেরার ব্যবস্থা কর। যা বলছি শোন।

সত্যি, মাদী বনে গেছিস্ মাইরি ফণ্টে। না হয় বে' করেছিস্, তেড়ও বেরিয়েছে। তাই বলে এত ভয়? আমারও শালা তোব মতই সব আছে। শুধু তোর দুটো আর আমার একটা। সেজন্যে কি মাগের আঁচল ঢেকে বেড়াব? আচ্ছা জ্বালা তো। নিজেব কাজে মন দে'। আনশান নিয়ে মেলা কিচাইন বাঁধাস্‌নি।

রেগে গিয়েই টেলিফোন রেখে দিল ও।

ফের ট্যাক্সিতে উঠে পরেব অফিসটায় চললাম টেণ্ডার দিতে। কিন্তু ভাবনাটা আমায় জ্বালিয়ে মারল। ঠিক করে ফেললাম কী করব। তারপরে আবার একটা পাবলিক কল-এ এসে ডিরেক্টরি ঘেঁটে কাবুলেব কারখানার ফোন নম্বর বের করে চেষ্টা করলাম ওকে ধরতে। ডিপার্টমেণ্ট জানা নেই। তবুও নাম বলে ওর হদিস যদি মেলে এইটুকু আশা। কিন্তু লাইনটা ছাই কিছুতেই পাওয়া গেল না। হয় প্যাঁ প্যাঁ করে নইলে খুট্ করে শব্দ হয়েই চুপচাপ।

সময় বয়ে যাচ্ছে এদিকে। নিজের কাজেই ছুটলাম আবার প্রাণপণে। যাকেই হোক খবরটা দিতে হবে। ফোন নম্বরও জানি না সকলের অফিসের বা কারখানার। তবে মোটামুটি জানি, কোথায় কাকে মিলবে।

একটার মধ্যে ঝড়ের বেগে নিজের তালগুলো সামলে নিলাম। তারপর চলে এলাম চৌরঙ্গীতে। জানাশোনা রেস্টুরেণ্ট থেকে আবার ফোন করলাম কাবুলকে। যোগাযোগটা সময়মত হয়েছিল। কাবুলের নাম বলতেই হদিস মিলল ওর। নিজগুণেই ও কারখানায় সবায়ের কাছে পরিচিত।

ফোন ধরল কাবুল।

মুরারি বলছি রে কাবুল।

কী ব্যাপার ফন্টাদা ?

গলা নামিয়ে যতটা সম্ভব কম কথায় আভাস দিলাম ব্যাপারটার।

হুঁ। এমন একটা বেইমানী হবে আঁচ করেছি আমরা। তবে এত শিগ্‌গির ? তা তুমি সাচ শুনেছ তো ? না কি গিয়ে বিলকুল বুদ্ধু বনে যাব ?

যা বলেছি, তাই শুনেছি। কোন কিছু হলে তখন তো আরো বুদ্ধু বনবি।

আচ্ছা, ঠিক আছে। গুরু কটায় বেরোবে ফ্যাক্টরি থেকে ?

সাড়ে চারটেয়, তাই বলেছে।

ঠিক আছে। রেডি করে নিয়ে যাচ্ছি। হারামীর বাচ্চাদের আজ ফুটি ফাটিয়ে দোব, দেখে নিও তুমি।

শোন্, মাথা গরম করিস্ না যেন আগে থেকে। আমিও যাচ্ছি।

আসবে ? একটু থামল কাবুল। তারপরে আবার বলল, কী দরকার ? আমরা তো আছি। তুমি আবার এ্যাদ্দিন পরে এসব কারবারে লাগবে ?

না রে কাবুল, আমি যাব। তোদের তো আর অসুবিধে হবে না ?

তুমি গেলে আমাদের আর কী অসুবিধে। বরং . একটু থেমে ফের বলল কাবুল, ঠিক আছে। এসো তবে খালি এসো না। কিছু আনতে পারবে না বাড়তি নিয়ে যাব ?

আনিস। আমিও দেখছি।

ফোন নামিয়ে রেখে যেন সোয়াস্তি হল একটু। এক পুরোনো পার্টিকে পগিয়ে খোকা হাতালাম একটা। কিছু গচ্চা গেল। তারপর অন্য টুকিটাকি কাজ সেরে ডালুর ফ্যাক্টরির দিকে চললাম।

গেটে পৌঁছেছি তখনও সাড়ে চারটে বাজেনি, দশ মিনিট বাকী আছে। একেবারে ঠাণ্ডা-মার্কা রাস্তাঘাট।

দারোয়ানের কাছে খবর নিলাম প্রথমে। যা বলল দারোয়ান, তাতে চোখ ট্যারা।

পাড়া থেকে কার নাকি ফোন এসেছিল জরুরী। তাই চারটের সময়ে চৌধরীবাবু ছোটি করেছে। একাই বাইক নিয়ে চলে গেছে।

মগজের ঘিলু যেন ঘেঁটে গেল কেমন! সাড়ে চারটে বলে চারটের সময় কেটে পড়ার কী তাল বাধল আবার? নাকি ইচ্ছে করেই আমাকে আধঘণ্টা পেছিয়ে সময় বলেছে? ফোন এসেছিল, বলছে দারোয়ান। কাসের ফোন? কে করেছিল? সত্যি সত্যি কোন জরুরী কাজে ওকে কি কেউ ফোন করেছিল, না অন্য কোন ব্যাপার? ফল্‌স্ দেয়নি তো?

কু-ভাবনাটাই আমাকে চাবকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। হাঁটছি হন্ হন্ করে। পুরোনো ফর্ম নেবার চেষ্টা করছি। সেই বেড়াল-পায়ে চলা, কুত্তার মত গন্ধ খোঁজা আর কান শানিয়ে ঘোরাঘুরি করার অভ্যাসটা চলে গেছে। ফের তেমন হতে আর পারব না বুঝে দুঃখ হল। তবুও পথের চারপাশে যতটা পারি চোখ রেখে চললাম। মেশিনটা এমন করে ফিট করে নিয়েছি যাতে এ্যাকশান দরকার হলেই চোখের পলকে চালাতে পারি।

বিরলের দল জানে, আমি অনেক আগে ডালুর দলের চাঁই ছিলাম বটে কিন্তু এখন আর ওসবে নেই, নিজের অন্ন ঠেকাতেই আছি। মাঝেমধ্যে ক্যাশ হাঁকড়ায়, দিই একশো কি পঞ্চাশ। বুঝিয়ে বলি, কখনো বোঝে আবার কখনো মেজাজ নেয়। তবে তেমন কিছু করে না, শাসিয়ে যায়। পরের বার চাইতে এলে পুষিয়ে নেবে। অতএব আমার সঙ্গে ওদের রিলেশানটা খারাপ নেই। কখনো বা বলে, তোমার বাড়ী থেকে চারটে লোকের দু-দিনের খোরাক দিতে হবে। দিতে হয়। এগুলো হল হরবখৎ ফাউ।

সত্যি কথা বলতে কি, ভয় করতাম ওদের শালা কোন সময়ে এসে হয় পাইপ ঝেড়ে দিল, নইলে চাল কুমড়ো কাটার মত মুণ্ডুটা

এক কোপে ছিনতাই করে দিল বডি থেকে। শিবের বাবার সাধ্যি নেই যে আটকাবে। পুলিশকে পুলিশ, অফিসারকে অফিসার মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে গাদা গাদা। কাজেই যা করতাম ওদের কথায়-- নেহাত ভয়ে ভয়ে।

এখন আর সে ভয় নেই, যা হয় হবে। পর পর ছ'টাকে তো ফেলব। তারপরে দেখা যাবে।

উত্তেজনা নিয়েই চলেছি সোজাসুজি পথে। বটতলা পার হচ্ছি। এ জায়গাটায় ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিরলের চ্যালারা থাকে—ওর পার্টির এ্যাকশানবাজরা চেনে আমায়। এদিক দিয়ে নিজের বাড়ী ফিরতে গেলে তার সোজা রাস্তা এটা তাও জানে। এদিন কিন্তু কোন ঘাঁটিতে চেনা ছোড়াগুলোকে দেখছি না। কাজেই মনের মধ্যে নানারকম চিন্তা। ওরা কি গুটিয়ে নিয়েছে? মেজর এ্যাকশানের আগেই তো এমন করার দরকার হয়।

রাস্তাটা বটতলা কলুপাড়ার সীমানা বললে হয়। পুলিশভ্যান এখানে ঢুকতে সাহস করে না। একবার নাকি জবর পুলিশ পার্টি ঘিরতে এসেছিল এই এলাকা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নাকি খবর মিলল পুলিশ ইন্‌ফরমারের কাছ থেকে ডিনামাইট সাজানো আছে পুলিশ-ভ্যানের পথে। সিগন্যাল হবে প্রথম ভ্যানটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে, তখন তৈরী হয়ে যাবে ডিনামাইট স্কোয়াড। শেষ ভ্যানটা রাস্তায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ফাইন্যাল সিগন্যাল হবে—সঙ্গে সঙ্গেই চার্জ! রাস্তাশুদ্ধু ভ্যানগুলো উড়ে যাবে। ব্যাস! পুলিশের ঘিরে ফেলার প্ল্যান ভেস্তে গেল। খোঁজখবর করে পরে দেখা গেল খবরটা বাড়ানো। কিন্তু একটা হাল্কা ডিনামাইটের সন্ধান মিলেছিল।

সেই রাস্তা দিয়েই হাঁটছি, যার খানিকটা উড়ে যেত; যার ওপরে সাদা পোশাকের পুলিশ বেশ কয়েকটা খুন হয়েছে; সাদা পোশাকী পুলিশের লোক এই সন্দেহে অচেনা ছু-ছুটো লোক প্রাণ দিয়েছে।

হুঁশ হল, আমার পাশাপাশি পা মিলিয়ে চলেছে একটা ছেলে।

চিনি না, এ পাড়ার বলে মনে হয় না। এটা নিশ্চিত, আমার পিছু নিয়েছে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এ্যাকশান করবে।

চোখোচোখি হতেই জিজ্ঞাসা করল—কোথায় যাচ্ছেন ?

গলাটা চাপা কিন্তু বেশ গম্ভীর।

কেন ?

বললে আপনার ভালো হবে।

তৈরী হয়েই আছি। আরও একটু সজাগ হলাম। রাস্তায় লোকজন কম হলেও একেবারে নির্ঝাট বলে মনে হল না। অনেকগুলো নজরই যেন নানা ফাঁক দিয়ে রাস্তাটাকে পাহারায় রেখেছে।

বাড়ী ফিরছি।

কোথায় বাড়ী ?

বললাম। জানালাম, পাশের পাড়ার বাসিন্দা। এ পাড়ার সকলেই চেনে। প্রায়ই যাতায়াত করি।

ঐ গলি দিয়ে যাবেন না, ঘুরে যান।

কেন ?

বারণ করছি, কথা শুনলে ক্ষতি নেই বরং লাভ হবে।

মাথার মধ্যে চড়াৎ করে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মেজাজটা সামলে নিয়েছি। একটু হেসেই জানালাম, ঐ গলি দিয়েই যাতায়াত করছি দু-বেলা।

করুন না। কালও যাবেন। কিন্তু এক্ষুনি—

এক্ষুনি কী ?

গোলমাল আছে, ও পথে না যাওয়াই ভালো।

তুমি এ পাড়ায় থাক ?

আপাততঃ থাকছি।

জানলে কী করে, গোলমাল আছে

জানি বলেই বলছি, কেন খামোখা –

গলির সামনাসামনি এসে পড়েছি। বেঁকতে যাব -দেখি ওদিক দিয়ে সামনাসামনি এসে পড়েছে নেপাদের দলটা। জনাদশেক হবে। থমকে দাঁড়ালাম ওদের দেখে।

ছেলেটা পাশ কাটিয়েই বটতলা লেনে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজ সুরু হল পরের পর। পেটো ছেড়েছে দুটো, তারপরেই গলির মধ্যে হাওয়া হয়েছে সে। কিন্তু পাশের বাড়ী-গুলোর ছাদ বারান্দা, এমনকি জানলা দিয়েও দমাদ্দম পেটো পড়তে লাগল।

তাহলে সবদিক দিয়েই তৈরি আছে ওরা আজ। খুব সম্ভব কাজও হাসিল হয়ে গেছে ওদের, কিংবা হাসিল হবার মুখে। বড্ড দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আর আফসোস করে লাভ নেই।

সবাইকে একটু সরিয়ে নিল নেপা। ইশারায় আমাকেও সরিয়ে দিল। যে পথে এসেছিল ওরা সেই পথে সকলকে নিয়ে চলল নেপা। ওদিকে পেটো পড়া বন্ধ হল।

গোটাকয়েক বাড়ী ছেড়ে এসে গ্যারেজ একটা। প্রকাণ্ড গেটটা বন্ধ। গ্যারেজের পেছন দিয়ে একটা পুকুর, জানা আছে। টপাটপ গ্যারেজের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে ভেতরে পড়লাম আমরা। কয়েকটা লোক গাড়ী মেরামতির কাজ করছে। দলটাকে দেখে তারা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কেউ কোন কথা বলল না। বোবা বনে যাওয়া লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে পেছনের দরজায় এসে গেলাম আমরা। খুলে পেছন দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পুকুরের কোল ঘেঁষে ওপারে উঠতে না উঠতেই সামনের দিকে পরপর গুলির আওয়াজ হল ক'টা।

মাথা নীচু করে আঁকাবাঁকা পজিশানে দুটো পাশ নিয়ে ঘাটের রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছি আমরা। এদিকার বসতি বেশির ভাগই একতলা পুরোনো বাড়ী কিংবা টালি-খোলা বা টিনের ঘর। আর একটু গেলেই মনে হচ্ছে বটতলা লেন রাস্তার ওপরে গিয়ে ওঠা যাবে। পথ

ছেড়ে বিপথে বেঁকল নেপা। বাড়ীগুলোর ফাঁকের অলিগলি কিংবা আঁস্তাকুড়, খাটা পায়খানার পাশ দিয়ে, খোলা কাঁচা নর্দমা ডিঙ্গিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছি আমরা।

নেপার নেতৃত্বই মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু ওর এই পথে এমন করে দলটাকে নিয়ে চলা ভাল লাগছিল না আমার। যে সব বাড়ীগুলোর আশপাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা, সেগুলো জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল আমাদের অনেকে। অনেক জানলা বন্ধ হয়েও যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে ঘিরে ফেলবে আমাদের। পালানোর পথ মিলবে না।

তার প্রমাণও মিলল। একটা সরু কানা গলিতে এসে উঠলাম আমরা। ছুটে গলিটা শেষ করে বটতলা লেনে পড়তে না পড়তেই চোখে পড়ল দু-দিকেই দাঁড়িয়ে আছে দলবল।

এমন অবস্থায় নেপার দল দেখে খানিকটা অবাক হয়ে গেছিল ওরা। মনে হল, তেমন তৈরীও ছিল না। নেপা স্টেন ধরে ছাড়তে সুরু করল একদিকে আর একদিকে বোমা ছুঁড়তে লাগল আরও কেউ কেউ। ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা চোখের নিমিষে।

এগিয়ে গেলাম আমরা সামনে এবং পেছনে নজর রেখে।

নেপা নির্দেশ দিল সকলকে হাতের কায়দায়, আশপাশেও নজর রেখে চলতে।

জানি না কোথায় চলেছি আমরা, লক্ষ্য কী! এদিকে গেলেই যে ডালুর সন্ধান মিলবে তার কোন ঠিক নেই। সন্ধান, মানে লাশটা তল্লাস করা। এতসব আয়োজন, এর পেছনে কি কোন মতলব নেই?

গলির দু'পাশের বাড়ীগুলো ঠাণ্ডা হয়ে আছে। মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তেই ওগুলো থেকে চার্জ সুরু হবে।

একটু পরেই বোঝা গেল নেপার লক্ষ, একটা ঘেরা মাঠ। কোন কোম্পানী, কারখানা বা অন্য কিছু করার জন্যে খানিকটা জায়গা

কিনে ঘিরে রেখেছিল পাঁচিল দিয়ে। গেটও বসিয়েছিল গালর রাস্তার ওপরেই। কিন্তু শেষ অবধি আর কারখানা হয়ে ওঠেনি। সেখানে নাকি ওদের চাঁদমারী হয়েছিল, তালিম দিত নানারকম।

সেই মাঠের গেট অবধি পৌছে দাঁড়িয়ে গেলাম।

গেট বন্ধ। কিন্তু নেপা হাত দিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল স্টেন আর একজনের হাত দিয়ে চারজনকে বাইরে পাহারায় রেখে গোল হয়ে হাতিয়ার বাগিয়ে ঢুকে পড়লাম আমরা।

খুঁজতে হল না। ঢুকেই অদূরে চোখে পড়ল ডালুদার চিত হয়ে পড়ে থাকা চেহারাটা। বাঁদিকের কলার-বোনের ওপর থেকে কোনাকুনিভাবে ডানদিকের পাঁজরের নাচে অবধি পাইপগানের গুলির পোড়াপোড়া গর্ত একেবারে মেপে বসানো। ঠিক যেন পৈতে পরিয়ে দিয়েছে। গলাটা হাঁ হয়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা।

ঘিরে দাঁড়ালাম আমরা। ঠিক যেন হেরে যাওয়া সেনাপতিব মৃতদেহকে ঘিরে কয়েকটা বুদ্ধু বনে যাওয়া পদাতিক।

এর পরের ব্যাপারটা আন্দাজ করতে অসুবিধে নেই কারো। তবে একখানা কাগজে লাল কালি কিংবা ডালুব রক্তেই বোধহয় লেখা ছিল ওর লাশটার ঠিক পাশেই--বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নেই।

অবাক হলাম, যখন এর পরে ছেলের দল হৈ-হৈ করে হাতিয়ার নিয়ে ঢুকল বটতলা লেনে, কোন সাড়াশব্দ পেল না ওদের দলের। তারপরে পুলিশ এল। ছেলেরা পুলিশ আর ভ্যান পাহারা দিয়ে লাশ তুলে নিয়ে পাঠাল মর্গে।

তারপর থেকেই আরম্ভ হল বদলা।

কাহিনী শেষ করে মুরারি বলল ঃ

এবারে বল্ ঐ পার্টি বা তার ছেলেদের ওপর কোন সিম্প্যাথি হয় কি না। ঐ ছোঁড়াগুলোকে যে ডালু কতভাবে তোয়াজ করেছে,

পুলিশের হামলা থেকে কতবার বাঁচিয়েছে, অপোনেন্টদের ঘেঁষতে দেয়নি ওদের ধারে কাছে, সে হল কি না বিশ্বাসঘাতক ?

বেশ বিচলিত দেখাচ্ছিল ওকে। সোজাসুজি আমার মতটা জানতে চায় ও।

বল্ না। চুপ করলি কেন, বল্! ও লোকটার প্রাণ যে কত বড় তা এখানকার লোকেরাই জানে। কার জন্যে কী না করেছে ও ? যারা তাকে খুন করল তাদের ঝাড়েমূলে লোপাট করে দেওয়া উচিত নয় কি ?

কী উত্তর দেব ? এর উত্তর আমি জানি না, দিতে পারব না। পাল্টা প্রশ্ন করলাম: ওরা অন্য কিছু সন্দেহ করেছিল নাকি ?

কা যে ওদের ঘটে আছে, জানি না। তবে ঐ একটা লোকের প্রাণের বদলা, যারা মেরেছে তাদের হাজারটাকে জবাই করলেও শোধ হবে না বুঝলি !

. চুপ করে শুনে গেলাম ওর ক্ষোভ, আক্ষেপ ও রাগের কথাগুলো। বলছিল ও, কেমন করে একটার পর একটা খুন করে গেছে ওরা। নির্বিরোধী মানুষও বাদ যায়নি, পেটের দায়ে যারা চাকরি করত পুলিশে তাদের তো কথাই নেই।

কোন সময়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মুরারির বাচ্চা চাকরটা, খেয়াল করেনি ও। একটানা বকে চলেছে। নজর পড়তেই লজ্জিত হয়ে বলল: এ্যাই দেখ্, মুড্ এসে গেছে বলে খাওয়ার কথাও ভুলে গেছি। চল ওঠ, অনেক রাত হয়ে গেছে।

খেতে বসলাম। অনেকক্ষণ থেকেই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল একটা কথা, বলে বসলাম: আচ্ছা মুরারি, যা হচ্ছে তা তো মিলনবাবুকে খতম করার বদলা। কী বলিস্ ?

আলবাৎ।

তাহলে ধর্ যেদিন খুন করল ওঁকে, সেদিন সন্ধ্যেবেলা থেকেই তো বদলা স্থুরু হবার কথা ?

হয়নি কে বলল ?

সেই রকমই তো শুনতে পাচ্ছি। এই কাণ্ডটা স্থুরু হয়েছে তো তারও একদিন পরে ?

টুক্‌টাক্ স্ট্রে-কেস চলেছে। এমন ব্যাপারে প্রিপ্যারেশানে সময় লাগে না ?

" প্রিপ্যারেশান কীসের ?

এমন একটা মাস-আপসার্জ-এ তৈরী হতে হবে না ? আব তাছাড়া---

তাছাড়া কী ?

ওদের তো সব তালিম দেওয়া এ্যাকশানবাজ ছেলে ছোকবা। তাদের সঙ্গে লড়তে হবে তো ? কলুপাড়া বটতলায় ওদের বেড-ফোর্ট। সেই ফোর্ট ভেঙে-চুরে লেভেল করে দিতে হবে না ?

আচ্ছা, তাহলে তোরা যখন গেলি তেমন মহড়া নিল না তো কেউ তোদের ?

কী জানি ? একটু যেন ভাবনায় পড়ল মুরারি, তারপরে থেমে থেমে বলল, বোধহয় নার্ভাস হয়ে গেছিল ওরা। গুটিয়ে নিয়েছিল কলুপাড়ায়—যেটা ওদের সেণ্টার।

আর একটা কথা। তুই বেরোতে ভয় পাচ্ছিস কেন ? সবাই তো জানে, তুই মিলনবাবুর লোক।

কে জানে ?

যারা এসব কাউণ্টার-এ্যাকশান করছে ?

ক্ষেপেছিস্ ? তারা কেউ চেনেই না আমাকে। এই এরিয়ার মাত্র কটা ছেলে ঘুরছে ওদের সঙ্গে। বললাম না সবই বাইরের ?

কেন, বাইরের সব আসবে কেন ?

কী জানি ? পাড়ার বেশির ভাগ ছেলেই সরে আছে। খবব দিয়ে গেছে ওরা। তিনটে দিন বাইরে এলোমেলো বেরোতে মানা করে গেছে। ওরা অবশ্য কয়েকটা বাড়ী বিশেষ করে দেখিয়ে দিয়েছে,

যেগুলো একেবারে নিজেদের বা নিজেদের লোকের। সেই বাড়ী-গুলোর ওপরে কোন হুজ্জুৎ হবে না। তাই বলে আমরা যা খুশি তাই করতেও পারব না। হয়তো আমাদের এই গলিটুকুর মধ্যে এক-আধটু যেতে-আসতে পারি। তাই বলে ঐ এরিয়ায়?

কাউকে খোঁজার জন্যেও যেতে পারিস্ না?

না, এখন আর পারি না।

ধর, তোর কোন আত্মীয়স্বজন যদি কলুপাড়া বা বটতলায় থাকত?

এ্যাকশান সুরু হবার আগেই সরিয়ে আনতে হতো তাদের। কোন না কোনভাবে খবর দিতে হত। যাক্গে, ভাবছিস্ কেন তুই? দেখি না কদ্দুর কী করতে পারি।

আর কোন কথা চলে না, এরপরে। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা রহস্য। এই যে খতম আর তার বদলা, এর গভীরে কোন ছক আছে। নিখুঁত প্ল্যানের ছক। হঠাৎ বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিতই বা হলেন কেন মিলন চৌধুরী আর বাইরের লোকে এসেই বা এ্যাকশান করছে কেন? কারা আনাল তাদের? কেনই বা তারা এই বদলা নিতে এগিয়ে এল? এ পাড়ায় মিলন চৌধুরীর দলবলের সংখ্যা বড় একটা কম নয়।

স্বেচ্ছায় সরে গেল তারা, না কোন অলক্ষ্য নির্দেশ তাদের ক্ষান্ত রাখল প্রিয় নেতার মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া থেকে?

সব ব্যাপারটাই একটা মস্ত জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার উত্তর কি পাব না? কোন সূত্রই মিলবে না?

খাওয়া শেষ করে আবার সেই দোতলার ঘরে গেছি আমরা।

বেশ কিছুক্ষণ জেগে থাকতে হবে আমাদের। মুরারি জানাল।

জানি। কিন্তু সারারাত জেগে থাকলেও যার অপেক্ষায় থাকব আমরা—সে আসবে কি?

কেন, ঘুম পাচ্ছে তোর?

ঘুম পায়নি। শুধু কালকের কথা ভাবছি। কী করে যে ছেলেটাকে খুঁজে বের করব?

কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। তবে আমার মনে হয়, চিনে এসে যাবে।

চিনে কে?

যাকে আসতে বলেছি রাতে।

সে ব্যবস্থা করতে পারবে তো?

কেমন করে বলব? ওকে সব কথা বলি, তারপর দেখা যাক কী বলে ও। এখানকার সব কিছু পাল্টেছে জানিস তো?

জানব কেমন করে?

না জানলেও চলে তোব। এককালে মস্তানী করেছি তো, কাজেই বুঝি ব্যাপার-স্যাপার। আমাদের কালে এমন ব্যাপার হলে তোর মুখ থেকে কথা খসার আগে তোর বৌদির ভাই না কে—সে ব্যাটাকে টিকি ধরে এনে ফেলতাম। এমন করে অন্য কারো ওপর ঝুলতিস্ করতে হত না।

নির্বোধের মত চেয়ে রইলাম মুরারির দিকে।

তুই শালা কেমন যেন ভেবলু মেরে যাচ্ছিস্। আরে বাবা, যদি জানে বাঁচে সে ছোড়া, ঠিক তার সন্ধান মিলিয়ে দোব তোকে। তবে সোজা কলে পানি ঝরবে না। মহাখিটকেল কারবার সব আজকাল।

চুপ করে বসে রইলাম আবার কিছুক্ষণ। ঘড়িতে সওয়া এগারোটা। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, অন্ধকার রাত যেন একটা বিশেষ বৃত্তচাপে জমাট খেয়ে আছে। সেটা ছাড়িয়ে টিম্ টিম করছে রাস্তার আলো কিংবা মার্কারী-ফ্লুরেসেণ্টের আভা জ্যোৎস্নার মত হালকা আলো ছড়াচ্ছে কোথাও কোথাও—তার আভা দেখা যাচ্ছে। জমাট বাঁধা অন্ধকারের রাজ্যটুকুতে ক্বচিত কোন বাড়ীর জানলা বা দরজায় আলো জ্বলছে। কেরোসিন বাতি, লণ্ঠন কিংবা কুপীর ক্ষীণ আলোর কুণ্ঠিত প্রকাশ চোখে পড়ে কি পড়ে না।

হঠাৎ দুজনকেই চমকে দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল কেউ। চকিত আওয়াজ তুলেই থেমে গেল।

আসছি।

নেমে গেল মুবাবি। একটু পবেই কোলাপসিবল গেট আব দবজা খোলাব শব্দ পেলাম। কাউকে নীচু গলায় ভেতবে আসতে বলল মুবাবি। একটু পবেই আবাব বন্ধ কবে তালা দেওয়াব শব্দ।

সিঁড়িতে মুবাবি ছাড়াও অন্ততঃ আব একজনেব পাযেব আওয়াজ শুনলাম। যথাসময়ে একজনকে সঙ্গে নিযে ঘবে ঢুকল মুবাবি। আগন্তুকেব বক্তাক্ত ক্লান্ত সৈনিকেব মত আবিভাব দেখে চমকে উঠিনি আমি। যেন এমন কাবো দর্শন চাইছিলাম, সবাসবি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসবে যে।

এসেই যেন হাত-পা এলিযে দিযে বসল সে। এবই নাম বোধহয় চিনে। মুবাবিব ডাকে সাড়া দিযে এসেছে। সত্যি এসেছে। অনেকক্ষণ ধবে বসিযে না বেখেই দেখা দিযেছে এসে।

-আমাব বন্ধু—নামটা বলল মুবাবি। ওব জন্যেই তোকে ডেকেছি।

কী হযেছে? শান্ত কিন্তু বেশ মেজাজী গলায জানতে চাইল সে।

আমাব উদ্দেশ্য সংক্ষেপে জানিযে দিল মুবাবি। তাবপবে বলল:

ছোটবেলাকাব বন্ধু, বুঝতেই তো পাবছিস। মনে কব, ওব ব্যাপাব আব আমাব ব্যাপাব এক। এখন আমাব জন্যে কী কতটা কবতে পাববি বল দেখি?

হুঁ। বেশ গম্ভীবভাবে ব্যাপাবটা বুঝতে চেষ্টা কবল আগন্তুক। তাবপবে সংক্ষেপে বলল, লেট হয়ে গেছে। ঠিক কোন জাযগায ছোড়াটা আছে, জানেন? নাম কী?

ঠিক কোন জায়গায আছে জানা যাযনি। তবে শুনেছি বটতলা কলুপাড়া লেনে শেলটাব নিয়েছে এসে। নাম মৃদুল নন্দী। মনগড়া নামই বলে দিলাম একটা।

খুঁজে বেব কবা মুশকিল। বাইবেব ছোড়া তো। তবে যদি

কলুপাড়ায় ঢুকে পড়ে থাকে, টিঁকে আছে এখনো মালুম হচ্ছে। অন্য কোথাও থাকলে ফুটে গেছে নির্ঘাত। ঐ শালা কলুপাড়ায় ঢুকতে পারা যায়নি এ অবধি।

বটতলায় ঢুকে গেছিস তোরা? জিজ্ঞাসা করল মুরারি।

হ্যাঁ। বটতলা সাফ। বস্তিটা জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। কিন্তু কলুপাড়ার দুটো মুখ এমন ঘাঁটি করে বসে আছে, ঢোকা যায়নি। আশপাশের মাঠ আর পুকুরগুলো থাকাতে খুব সুবিধে হয়ে গেছে ওদের। ওরা সবাই ঝাঁক বেঁধেছে কলুপাড়াটায়। খবর হল ডিনামাইট, এল্‌এম্‌জি, এস্‌এম্‌জি-ও আছে। তবে আজ রাত শেষ হতে না হতেই ঢুকে পড়ছি আমরা। তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ছেলেটার কী হবে বলতো চিনে? উদ্বিগ্নকণ্ঠে জানতে চাইল মুরারি।

শুনেছ তো দাদা, পাড়ার মাত্তর ছ'জন আছি আমরা। শুধু পথঘাট সন্ধান বাতলাবার জন্যেই ওদের এক এক দলে এক একজন করে রেখেছে আমাদের। তাও সব দলে নেই আমরা, কোন কোনটায়—

এ্যাকশান করছিস না তোরা?

না! আচ্ছা বল্‌ তো দাদা, এত সব জানাশোনা, মুখচেনা ছেলেছোকরা লোকজনকে এমনি ধরে ধরে সাবাড় করা যায়? কেমন একটা চাপা বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল চিনের গলায়।

তবে এত ল্যাপ্টালেপ্টি করেছিস্ কেন? জামাপ্যাণ্টের দিকে চেয়ে দেখেছিস কী অবস্থা?

কী করব বল? এলোপাথাড়ি সাবড়ে যাচ্ছে ওরা। আশপাশে থাকতে হচ্ছে। টানা হেঁচড়া করতে হচ্ছে। ধরতে হচ্ছে। উপায় নেই তো! শুধু শালা ডাঁটো হয়ে থাকছি ডালুদার কথা ভেবে। বদলা নিতেই হবে। সে শালা পেটের ছেলেই হও আর জন্মদাতা বাপই হও।

কোথাকার দলবল সব ?

কী জানি ? হঠাৎ চুপ করে গেল চিনে।

তোরা এসব মানলি কেন ? আমাদের ব্যাপার, ফয়শালা আমরাই করতাম। বদলা যা নেবার আমরাই নিতাম। বাইরের সব পার্টিকে এসব করতে দিচ্ছিস কেন তোরা ?

কী করব বল ? অসহায়ের হাসি ফুটল চিনের মুখে। সরে গেছে সবাই। নেপা, কাবলে, মিণ্টু, টোপলা, রমেশ সকলে পাড়া ছেড়ে কেটেছে। নেপা আমাদের ডেকে থাকতে বলে গেল।

কেন ? কাটল কেন ওরা ? কালকের সকালের প্রসেশানে তো ছিল সবাই।

জানি না দাদা কী ব্যাপার। জানোই তো আমাদের উপায় নেই এখন।

বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছে মুরারি, বোঝা গেল। সোজা হয়ে বসে বলল :

ডালু থাকলেও এই কথাই বলত, আমাদের কারবার আমরা বুঝব। তা দেখ্ চিনে, আমাদের এখানে কখনো আমরা বেপাড়ার মস্তানদের পাত্তা দিইনি। ঐ সব খতমবাজি সুরু করল বিরলের দল, তারপর থেকেই এই সব কেলোর কেত্তন হয়ে চলেছে। তোরা একেবারে যাচ্ছেতাই।

অদ্ভুত হাসি হাসল চিনে।

ফণ্টাদা, সে জমানা আর নেই গো ! তোমরা যে সব দিন কাটিয়ে এসেছ এককালে, তা আর নেই। এখন আচ্ছা-আচ্ছা বোম্বাই মস্তানকেও সমঝে চলতে হয়।

কিছু একটা বলতে গিয়ে আবার থেমে গেল চিনে। তারপরে হাল্কা সুরে বলল : বাড়া তো খালি রেখেছ। মালঝাল আছে কিছু, ছাড়বে ?

বোস্। আসছি।

বেরিয়ে ওপরে উঠে গেল মুরারি।

ঘড়িতে সাড়ে বারোটা। নিশুতি রাতের গুরুভার নৈঃশব্দ্য কাঁপছে থরথরিয়ে। কোথাও কোথাও অবরুদ্ধ কান্না যেন ফেটে পড়ার পথ পাচ্ছে না।

ছোড়াটা যদি বেঁচে থাকে, তাকে বাঁচাতে চান?

সোজাসুজি আমার দিকে চেয়েই জিজ্ঞাসা করল চিনে।

নিশ্চয়ই।

তাহলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে আমার সঙ্গে। পারবেন?

পারব।

ক'টা জায়গা ঘুরিয়ে নিয়ে যাব আপনাকে। চিনতে পারবেন লাশ দেখলে?

ঘাড় নেড়ে জানালাম--পারব।

যদি না মেলে তার মধ্যে—, একটু থামল চিনে, আপনমনেই বলল, কতকগুলো যে আবার শালা পাচার হয়ে গেছে। যাই হোক্, না মিললে আপনাকে কলুপাড়ায় ঢুকিয়ে দিয়ে আসব আমি।

বেশ।

তারপরে যদি পটকে যান, ফন্টাদা যেন আমায় না দায়ী করে আবার।

না, না, সে দায় আমার নিজের। ইচ্ছে করেই তো যাচ্ছি।

ফন্টাদা আসুক। কথাবার্তা হোক। ওর মত হলে তবেই আপনার কথা শুনব। নইলে নয়। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে মুরারি এসে ঢুকল। সাজসরঞ্জাম নিজে নিজেই বয়ে এনেছে। বগলে দুটো বোতল, হাতে ছোট্ট সৌখীন গ্লাস কয়েকটা। এনে নামিয়ে রাখল টিপয়ের ওপর।

তুই খাবি তো? জানতে চাইল মুরারি।

নাঃ! ভালো লাগছে না।

আরে দাদা বাদ দিন ওসব ছোঁড়াদের ভাবনা। তার যা হবার তা তো হয়েই গেছে বা হবেই! আপনি আমি কিছু ঠেকাতে পারব

না। দুঃখু করে কী লাভ? দিন পানসি ভাসিয়ে, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমাকে উপদেশ দিতে দিতেই একটা বোতল তুলে নিয়েছে চিনে। অভ্যস্ত কায়দায় দাঁত দিয়ে কর্ক খুলে গ্লাসে ঢালতে আরম্ভ করল আপনমনে।

ভদ্দল্লোক যখন তোমার ইয়ার দোস্ত, তখন ওকে বলছিলাম—

প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করল চিনে।

কিন্তু যদি কোন—মানে গড়বড় ঘটে যায়।

যতক্ষণ আমার সঙ্গে আছে ভয় নেই। টুস্‌কি লাগবে না গায়ে। কিন্তু ওদেব এরিয়ার মধ্যে চলে গেলে আমি তো আর সঙ্গে থাকতে পারছি না। তখনকার ব্যাপারটাই হচ্ছে ভেবে দেখার। তা উনি রাজী হচ্ছেন। এখন তুমিও না রাজী হলে তো আর আমি করতে পাবব না কিছু।

এলোমেলো নজরে গ্লাসের পানীয়ের রঙটা দেখল মুবারি। বোধহয় আগুপিছু ভেবে নিল চিনে'র কথাগুলোর। তাবপরে জিজ্ঞাসা করল আমায়ঃ কী বলিস্ তুই?

যাব। বলব কী আবার?

কী হতে পারে আইডিয়া করতে পাবিস্?

পারি। কিন্তু দ্বিতীয় কোন পথ নেই। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হাতে। যা কবাব এরই মধ্যে শেষ কবে দিতে হবে আমায়। খবর পাই আব না পাই। প্রাণ থাক আর যাক।

তুই তো শালা মহা বেগোড় বাধালি। যেতে চাস্, যা। কিন্তু তাবপব কোন উল্টোপাল্টা হলেই যে ফেঁসে যাব আমি।

তুই ফাঁসতে যাবি কেন? এসেছি নিজের দরকারে! তারপবে সব জেনেশুনেও নিজের মতলব মতই যাচ্ছি। তোর বিপদে পড়াব কোন্ প্রশ্ন ওঠে না।

আমার কথা বলেই তো বাড়ী থেকে এসেছিস। তারপবে

লোপাট হবি তুই, আর ঝুড়ি ঝুড়ি কৈফিয়তের হুজ্জুত পোয়াতে হবে আমাকেই।

বলে দিবি তুই, এসেছিল বটে কিন্তু জোর করে চলে গেছে। কোন দিক দিয়েই কোন দায়িত্ব বা ঝামেলা থাকছে না তোর।

তাহলে আমিও যাই সঙ্গে।

খেপেছ ? তাও কি কখনো হয় ? বলল চিনে। এখন তো বাবা তুমিও লম্বুরী মাল হয়ে গেছ। ঢুকতেই পারবে না ওদের এরিয়ায়। তারপর এই দাদাকে নিয়ে একসঙ্গে ঝুলবে ?

মুখে অদ্ভুত আওয়াজ করল চিনে। গ্লাস ভরিয়ে বলল আবার, তোমার দিমাকটা সত্যি বিগড়েছে, দাদা।

আমার দিকে চেয়েই বলল মুরারি : চালাতে পারবি ?

ইঙ্গিতটা ভারী স্পষ্ট। বললাম, না। অভ্যেস নেই ওসবের।

তবে আর কী হবে ? চালাতে পারলে না হয় হাতে ধরিয়ে দিতাম একখানা। এমনি যা। পুলিশের লোক সন্দেহে খতম করে দেবে তোকে। তোর বৌদি আর দাদা আবার তোর জন্যে ফ্যাচফ্যাচাবে খানিক। ভায়ের জন্যে না হয় বৌদিকে খানিক বাড়তি কেঁদে নিতে বলব।

বলিস্, তবে দেখ্, খতম না হতেও তো পারি।

সেটা তোর লাক। এ্যাকশানের মুখে পড়ে গেলে বা মাথাগরম ছোড়াদের পাল্লায় পড়লে খোঁচা ঠাউরে ঝাড়বে, তোকে।

হলে আর কী করা যাবে ?

ঠোঁট ওল্টাল মুরারি। বুঝছিলাম, ওর একটু আগের বন্ধুত্বের টানটা যেন ঢিলে হয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। বলল, যা শালা, মর্‌গে যা তবে। ঠাণ্ডা ইস্পাত বা গরম শীসে তোর বরাতে নাচছে। খাবি আর গিলে চিৎপাত হবি।

নীরবে কিছুক্ষণ ধরেই খেল ওরা।

বসে থেকে নিজের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করছিলাম মনে মনে। ছকে

নিচ্ছিলাম, কীভাবে কী করব। কেমনতরো পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়ব। কোনদিক দিয়ে কীভাবে 'মুক্ত অঞ্চলে' ঢুকতে পারব, জানি না। ঢুকেই বা কী পরিচয় দেব, কীভাবে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করব এ সব ভাবনা ভিড় করছিল মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবছিলাম, যদি পরিচয় দেবার কোন সুযোগই না মেলে, কথা বলার অবকাশ না ঘটে। আগে থেকে কোন আন্দাজ করে কিছু করে ফেলা বিচিত্র নয় এমন অবস্থায়।

তবে যদি সুযোগ মেলে, ঠিক পরিচয়টাই দিতে হবে ওদের কাছে। এদের কাছে ধাপ্পা দিয়েছি যে রকম, তা চলবে না। আজেবাজে নাম বললে কোন কাজ হওয়া দূরের কথা, সন্দেহ দেখা দেবে উল্টে মাঝে থেকে। তার পরিণাম ভাল না হওয়াই স্বাভাবিক। যা চাই, ওদের ক্যাম্পের খবর—সেটাই উদ্ধার হবে না।

এদিককার যা শুনেছি বা যতদূর দেখলাম, এখন ওপক্ষের চলেছে দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই—ব্যাক-টু-ওয়াল ফাইট। কোন অপরিচিত আগন্তুকের পক্ষে এমন পরিস্থিতির মধ্যে রেহাই পাওয়া দায়। তবে একটা ভরসা, আসল পরিচয় আর প্রেস ব্যুরো'র ছোট্ট পরিচয়-পত্রটা বাঁচিয়ে দিতে পারে।

হাসি পেল ভেবে। ঐ পরিচিতি এখানে বিপদ ডেকে আনবে আমার। ওখানে ওটাই হয়ত আবার আমার প্রাণ বাঁচানো'র একমাত্র অবলম্বন। ভাগ্যের পরিহাস? হবেও বা। এক চিলতে দুনিয়ার কয়েক গজ এপারে ওপারে জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান কত ক্ষীণ, কত ভঙ্গুর। কত স্বচ্ছন্দে, কী অবহেলায় ঘুচে যেতে পারে এই ব্যবধানের হাস্যকর অস্তিত্ব।

খাওয়া শেষ হল ওদের।

ইসারায় আমাকে উঠতে বলল চিনে। হাতব্যাগটা সঙ্গে নিয়েই নামলাম। দরজা আর গেট খুলে বিদায় জানাল মুরারি। আমার একটা হাত হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিয়ে বলল: হুঁশিয়ার। হয়ে গেলে দেখা করে যাস।

তারপরে অবশ হয়ে গেল ওর হাত। ছাড়া পেয়ে চিনের পিছু পিছু বেরিয়ে পড়লাম নির্জন গলিপথের দম আটকানো অন্ধকারে। চললাম অনিশ্চিতের পথে।

ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারা। প্রত্যেক জায়গাতেই চিনেকে দেখে ছেড়ে দিল। কিন্তু আমার পরিচয়টা জানতে চাইল। ইশারায় কিছু একটা জানাল চিনে', বুঝতে পারলাম না। এক জায়গায় বলল, ওর নিজের আত্মীয়—এ পাড়ার লোক, 'সেফ্ জোনে' পৌছে দিয়ে আসতে যাচ্ছে। যে দলগুলো জানতে চাইল, মনে হল ওরা ক্লান্ত, ভারী ক্লান্ত—মারণযজ্ঞের দীর্ঘ শ্রমে অবসন্ন ওরা। বুঝি বা কিছুটা নিরাসক্ত হয়ে পড়েছে কোন মানুষ বা তার প্রাণ সম্বন্ধে। বোধহয় কসায়ের দোকানের সেই কাতানের মত। যার রক্তমাংসে কোন বোধ নেই, আছে শুধু যান্ত্রিক ওঠানামা—ছিন্ন করা ভিন্ন করা।

'সেফ্ জোনে' যে নিয়ে যাচ্ছে, তা দেখাবার জন্যেই চিনে একটু ঘোরাপথে নিয়ে যাচ্ছে আমায়। হাঁটছি, হাঁটছি—মন্ত্রমুগ্ধের মত। কতক্ষণ পরে একজায়গায় থেমে কোন বাড়ীর অন্তরালে আমার কাঁধে হাত রেখে চাপ দিল চিনে। চাইলাম ওর দিকে। দেখতে পেলাম না মুখটা। বলতে পারলাম না আরো কোথাও কোথাও ঘোরানোর কথা ছিল আমায়। লাশ খোঁজার কথা ছিল।

নীরবে আঙুল দিয়ে অদূরে একটা গলির মুখ দেখিয়ে দিল চিনে। ইশারায় জানাল, ওর কাজ শেষ। ফিরে যাবে। পরক্ষণেই কোথায় যেন মিলিয়ে গেল ও।

এগিয়েই গেলাম গলির দিকে।

সবে পা দিয়েছি বাঁকটা ছাড়িয়ে। আশপাশের জমাট আঁধারের গলা শুনতে পেলাম : থামুন।

দাঁড়িয়ে গেলাম। আঁধারের কোন কোন অংশ ফালা-ফালা হয়ে কয়েকটা মানুষের চেহারা নিয়ে ঘিরে ধরল আমায়। ওদের হাতের বস্তুগুলো যেন অন্ধকার নয়। মারণাস্ত্রের আকৃতি চারদিক থেকে

স্থির হয়ে গেল আঁধারের অলৌকিক স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে—চোখের ওপরে। নড়ার উপায় নেই আমার।

নিরীক্ষণ করল ওরা সতর্কভাবে, শিবিরের প্রহরার মত।

কোথায় যাচ্ছেন?

আমি রিপোর্টার।

কোন্ পত্রিকার?

কোন পত্রিকারই নয়। ফ্রী লান্স। আপনাদের ব্যাপারটা কভার করতে এসেছি।

সন্দিগ্ধ ভাব চারপাশ থেকে স্পর্শ করল আমায়।

কী করে বোঝা যাবে, অন্য কেউ নয় আপনি?

আইডেন্টিটি দেখতে পারেন।

একটুখানি ভাবনা। তারপরেই একজন আদেশ দিল:

এদিকে আসুন।

গলির একপাশে নিয়ে গেল আমায়।

দেখি, আইডেন্টিটি আপনার?

বের করে দিলাম কার্ডখানা। আড়াল করে দেশলাইকাঠি জ্বেলে সেটা দেখল ওরা কয়েকজন। কার্ডটা ফিরিয়ে দিয়ে জানাল: একটু দেরী করতে হবে। যথাস্থানে খবর দিচ্ছি। অনুমতি মিললে পাঠিয়ে দেব। নইলে ফিরতে হবে। একটু দ্বিধা করে আবার বলল: বসতে দেবার কিছু নেই। এখানে দাঁড়িয়েই থাকুন। ভাবী দুঃখিত, বসতে বলতে পারা গেল না আপনাকে। একটু পাশে সরে দাঁড়াবেন।

নির্দেশিত জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম! আশপাশ যতটা নজর চলে দেখলাম। বাড়ীর গায়ে বাড়ী। তার ফাঁকে ছায়ার অন্ধকারে নজর গেল না। শুধু অনুভব করতে পারলাম, প্রতি বাড়ীর আশপাশ, এমনকি বারান্দা বা ছাদ বিনিদ্র পাহারায় সজাগ। কিন্তু নিঃশব্দ। খুবই সতর্ক এই নিঃশব্দতা।

সরু গলি। তারপরেই একটা চওড়া রাস্তার আবছা অস্তিত্ব টের

পাওয়া যায়। কয়েক হাত করে তফাৎ রেখে দু-চারজন নিঃশব্দ সঞ্চরণে উপস্থিতি জানান দিচ্ছে, আর কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। সবায়েরই রয়েছে হাতিয়ার। শূন্য হাতে কেউ নেই।

বোধহয় মিনিট পনের কুড়ি কাটল প্রতীক্ষায়। একজন লঘু পায়ে এসে আমার গায়ে হাত ছোঁয়াল। মৃদুকণ্ঠে বলল: আসুন।

অনুমতি মিলেছে তাহলে। বিনা বাক্যব্যয়ে অনুসরণ করলাম তাকে।

ছোট গলি পার হয়ে বড় রাস্তাটায় এসে সামান্য হাঁটতে হল। তারপরেই একটা বেশ বড় বাড়ীতে ঢুকলাম। বেশ সৌখীন হাল-ফ্যাশানের বাড়ী। সবে তৈরী হয়েছে। পেণ্ট্ভার্নিসের আর কলিচূণ ডিস্‌টেম্পারের গন্ধ মিলছে।

ঢুকেই বাঁদিকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। ডানদিকে একটা ঘর। পথ-প্রদর্শক সেখানে পৌঁছে দিল আমাকে।

অস্পষ্ট আলোতেও স্পষ্ট বোঝা যায় একনজরে, রীতিমত সুসজ্জিত ছিল এই বসার ঘরটা। মানানসই সব আসবাবপত্রই রয়েছে। তবে সবকিছুই এখন এলোমেলো, অগোছালো অবস্থায়। দেয়ালের ধারে ধারে সব ঠেলে মাঝে জায়গা করা হয়েছে একটু। এক কোণে জানলার দিক কাগজ দিয়ে আড়াল করে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। ঠিক ব্ল্যাকআউটের সময়কার ব্যবস্থার মত।

বসুন।

হাল্কা বেতের চেয়ার একটা টেনে এগিয়ে দিল আমার গাইড্। বসলাম।

অল্পক্ষণ পরেই দরজা দিয়ে প্রথমে ঢুকলেন একজন। পিছু পিছু আরো দু'জন এলেন। দরজা আটকে পজিশন নিয়ে দাঁড়ালেন ওঁরা দু'জন। গাইড বাইরে চলে গেল।

আর একটা বেতের চেয়ার নিয়ে আমার মুখোমুখি যিনি বসলেন, তিনি নিঃসন্দেহে এঁদের নেতা। কোন্ সারির জানি না।

বয়েস কত হবে? ত্রিশও হয়নি। হ্যারিকেনের টিম্‌টিমে আলোতে মনে হল, শ্যামলা রঙ। চওড়া ফ্রেমের চশমার পুরু লেন্স ভেদ করে মস্ত বড় বড় চোখ যেন গায়ের ওপরে এসে পড়ছে। পরণে কালচে রঙের তাঁতের মোটা সার্ট-পাঞ্জাবীর সমন্বয়ে বানানো জামা আর সাদা পায়জামা। এক মাথা অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল।

সৌজন্যের হাসি ফোটালেন মুখে। বললেন: খুব ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশানে এসেছেন। কিন্তু ওদিক পার হলেন কী করে?

কোনমতে। বাজে কথা বলে।

ওরা জানত, আপনি কভার করতে এসেছেন?

না। জানতে দিইনি। ট্যাক্টফুলি ম্যানেজ করেছি। এক বন্ধু ও-পাড়ায় থাকে, তার সাহায্য পেয়েই এসেছি, এক আত্মীয়ের ছেলেকে খোঁজার অছিলায়।

আপনাকে অভিনন্দন জানাই বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে।

ধন্যবাদ।

ওটা বুর্জোয়া সৌজন্য, মামুলী ভদ্রতা। আমাদের প্রয়োজন, প্রচার। বুর্জোয়া-প্রেসের প্রচারও এখন আমাদের কাম্য। যখন আপনি ফ্রী ল্যান্স, সব পত্রিকাতেই তো বেরোবে আপনার কভার?

আপাততঃ 'ফোকাস্‌' নিউজ জার্নালেই আমার রিপোর্ট বেরোবে।

সেটা তো আরো ভালো। আন্তর্জাতিক প্রচার হবে। আমাদের কথা জানতে এসেছেন?

শুধুই জানতে নয়। সম্ভব হলে প্রামাণ্য কিছু তথ্যও নিয়ে যেতে হবে আমাকে।

বেশ। কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন আপনাকে? আমাদের ম্যানিফেস্টো—

তা তো আর এখন গোপন নেই কারো কাছে। আপনাদের বক্তব্য, কর্মসূচী সবই একটু একটু করে সবাই জেনেছে। সে সম্বন্ধে

নতুন করে জানার নেই কিছু। আপনাদের এই অঞ্চলে যে ব্যাপার বলছে, সে সম্বন্ধেই তথ্য চাই আমার।

ও! অবশ্য এমন ব্যাপার একটু আগে আগেই এসে পড়েছে আমাদের ওপরে। খুব একটা প্রস্তুত না থাকলেও নেহাৎ অসহায় নই আমরা এখনো। এমন পরিস্থিতি যে-কোন মুহূর্তেই আশা করা উচিত বিপ্লবীদের। বিপ্লবের পথে তো আর ফুল ছড়ানো নেই। রক্ত যেমন ঝরাব, তেমনি ঝরতেও দিতে হবে। সেই কথাই বলে ইতিহাস। যখনি কোন অধিকার আদায় করেছে মানুষ তাব জন্যে তাকে মূল্য দিতে হয়েছে। শ্রেণী সংগ্রাম বিনা রক্তপাতে হবে এমন ধারণা বুর্জোয়া আর সাম্রাজ্যবাদীদের জারজ সন্তানেরাই পোষণ করে।

আচ্ছা মিলন চৌধুরীকে খতম করলেন কেন আপনারা ? সরাসরি প্রসঙ্গে এলাম।

খতম করলাম কেন ? সত্যি, আরও কিছুদিন দেরী করা উচিত ছিল। বড্ড তাড়াতাড়ি এ্যাকশান হয়ে গেছে। তবে বিশ্বাসঘাতককে বেশিদিন বাঁচতে দেওয়া বিপ্লবীদের নীতিবিরুদ্ধ।

মিলনবাবুকে বিশ্বাসঘাতক ভাবার কোন কারণ ঘটেছিল ?

অবশ্যই ঘটেছিল।

তিনিই তো এখানে আপনাদের সংগঠন গড়ে ওঠায় সাহায্য করেছিলেন। আশ্রয় দিতেন অনেককে। আপনাদের ছাড়িয়ে আনতেন পুলিশের কবল থেকে। যতদূর শুনেছি, তিনি না সাহায্য করলে এখানে কোন জায়গাই হত না আপনাদের। অবশ্য আমাব জানার মধ্যে ফাঁক থাকতে পারে।

একটু ফাঁক আছে। আসলে লোকটা ফ্যাসিস্ট মনোভাবের। তার অতীত কার্যকলাপ আমাদের জানা আছে। আসলে লোকটা বিপ্লবী চেতনার ধার ধারেনি কোনদিন। ওর দলবলও সেই রকম। আমাদের খবর সমস্ত সংগঠন ভেঙ্গে চুরমার করার চক্রান্ত লিপ্ত হয়ে পড়েছিল লোকটা।

কেমন করে বুঝলেন ?

ডাউটফুল ছেলেছোকরাদের আমাদের সংগঠনে ইন্‌ফিল্‌ট্রেট্‌ করিয়েছে গত দু'এক সপ্তার মধ্যে।

এতে ওঁর স্বার্থ কী ?

স্বার্থ শাসকশ্রেণীর।

তাতে উনি জড়িয়ে পড়বেন কেন ? সমাজসেবা নিয়েই তো তিনি থাকতেন।

বুর্জোয়া রাজত্বে সমাজসেবা বলে যা চলে তা হল চূড়ান্ত বঞ্চনা। অনেকটা জমিদার-জোতদার বা টাটা-বিড়লার দানধ্যান, ধর্মকর্মের মত প্রবঞ্চনা।

কথাটা একটু ব্যাখ্যা করবেন ?

ধরুন লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা চাষী-মজুরকে শোষণ করে কামিয়ে নিচ্ছে ওরা, তার কতটুকু অংশই বা দানধ্যানে দিচ্ছে ? গরীবের মেয়ের বিয়ে দেওয়ানো, মৃতদেহ সৎকার, সাময়িক সাহায্য কিংবা রোগীর চিকিৎসা ইত্যাদি দাক্ষিণ্য মানুষের নীচতা বাড়ায়। এ একধরণের হিউমিলিয়েশান।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হলেন কী করে উনি ?

এমন ভাবার মত কারণ ঘটেছে ; আগেই বলেছি।

কিন্তু যতটা শুনেছি, আপনাদের অনেক ছেলেকে তো উনি পুলিশী ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছিলেন ?

•এক মিনিট। একটু কিছু আপ্যায়ন করা উচিত আমাদের। চা খাবেন ?

খেতে পারি।

ইশারায় একজনকে জানিয়ে দিলেন নেতা। একটা কৌতূহল খোঁচা দিচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। প্রকাশ না করে পারা গেল না, বলে ফেললাম।

আপনার পরিচয়টা ... পাবি

আমি ভারতের কৃষি-বিপ্লবের একজন সামান্য সৈনিক এই পরিচয়ই যথেষ্ট। তার বেশি আর কোন পরিচয় নেই।

তা ঠিক। তবে সে পরিচয় তো আপনাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেওয়া চলে। আমার বক্তব্য, আমি যে ইণ্টারভিউ-র বিবরণটা দেব তার একটা স্বীকৃতি পেতে হবে তো। অজ্ঞাত কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের ব্যাপারটা গুরুত্ব পাবে না তেমন, এটাই আমার ধারণা।

গুরুত্ব পাবার যে অর্থ বলতে চাইছেন আপনি, সে অর্থ আমাদেব কাছে তুচ্ছ। আপনি লিখে দেবেন, চেয়ারম্যানের পার্টির একজন নগণ্য সৈনিকের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

একটু আসছি, কমরেড।

নারীকণ্ঠ পেয়ে সচকিত হয়ে তাকালাম।

খুব সাদাসিদে বেশবাসের এক তরুণী ঘরে ঢুকে পড়লেন।

বোসো। বললেন নেতা। ইনি আমাদের নারী গেরিলাবাহিনীব এক কমরেড। আর ইনি ফ্রী লান্স জার্নালিস্ট। 'ফোকাস্' পত্রিকায় এখানকার ব্যাপার কভার করার জন্যে কামোফ্লেজ নিয়ে এসেছেন।

নাকি ?

বিস্ময়ে তরুণীর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। সুন্দরী বলা যায়। ভাবী সুন্দর কমনীয়তা সারা দেহটাকে ঘিরে রয়েছে। মুখে এক অদ্ভুত ধরণের দৃঢ় মানসিকতার ছাপ। নেতা আবার বললেন ঃ

সমস্ত এলাকাটা রিপোর্টারদের হানা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। আসতে দেওয়া হচ্ছে না কাউকে। আমাদের খবর হল, বোম্বে আর দিল্লির অন্ততঃ চারজন রিপোর্টারকে ভাগিয়ে দিয়েছে ওরা—সোজা পিস্তল দেখিয়েই চলে যেতে বলেছে। লোক্যাল নিউজমেন জানতে পেরেছে আর তাদের ম্যানিপ্যুলেট্ করা হয়েছে। কেউ ম্যানেজমেণ্টের কথায় আর কেউ বাঁ ভয়ে ঘেঁষেনি এদিকে। সব চুকে গেলে তারা ভাসা-ভাসা রিপোর্ট দেবে।

আমরা কিন্তু আসল পয়েন্ট থেকে সরে এসেছি। নেতাকে মনে করিয়ে দিলাম।

সরে এলেও মিস্ করিনি। মনে রেখেছি। মিলন চৌধুরীর কথা তো?

হ্যাঁ।

ব্যঙ্গের হাসি ফুটল নেতার মুখে, বললেন: তাকে আমরা পার্টি তথা কৃষি-বিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করেছি। সেও চেয়েছিল আমাদের মধ্যে গুপ্তচর ঢুকিয়ে ক্যাডারের মধ্যে ভেজাল চালিয়ে পার্টিকে ভেঙে চুরমার করতে।

আমার খবর হল, তিনি তেমন কোন মতলব নিয়ে আপনাদের সাহায্য করেননি।

এর খানিকটা সত্যি। লোকটা আমাদের নানাভাবে সাহায্য দিয়েছে, মদং দিয়েছে। তবে কোন মতলব যে ওর ছিল না, তা নয়! উদ্দেশ্য ছিল ওর, নিজের গুণ্ডাদলের সঙ্গে আমাদের জয়েন্ট ফ্রন্ট করে নয়া সংশোধনবাদীদেব নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ফ্যাসিস্টচক্রের কব্জায় পড়ে যায় ও। সে ব্যাপারে অবশ্য আমাদেব ব্যর্থতা আব সাময়িক ভ্রান্তি ঘটেছে স্বীকার করছি।

ব্যাখ্যা করবেন?

অর্থাৎ দু-হাতের তালু এক জায়গায় এনে আবার ভাগ করলেন নেতা, বললেন—ওকে ঠিক বিচ্ছিন্ন রাখতে পারলাম না আমবা ফ্যাসিস্ট ঝোঁক থেকে। আবার এমন সময়ে ওকে খতম করে ফেলাটাও ট্যাক্টিক্যাল ব্লাণ্ডার হয়েছে।

তাহলে বিশ্বাসঘাতক বলছেন কী করে তাঁকে?

অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, পার্টির ভিৎ আলগা করে দিয়েছে লোকটা। যে কারণে, বটতলা এরিয়াটা ছেড়ে চলে আসতে হল আমাদের। ওখানে প্রচুর বাজে ক্যাডার ভিড় করে বস্তুত বিট্রে করল।

শুনেছি, ঐ এলাকাতেই খুন হয়েছিলেন উনি।

হ্যাঁ। আবার যারা ঐ এ্যাকশানে ছিল তারা কিন্তু সবাই বহাল তবিয়তে খোদ শহরের প্রকাশ্য রাজপথে বুক ফুলিয়ে মস্তানী করে বেড়াচ্ছে।

সে কী? জানে না কেউ, ওরাই মিলনবাবুর এ্যাসাসিন?

সকলেই জানে। এমন কি পুলিশেরও অজানা নয়। ঠিক খবর পেয়েছে ওরা।

তবে তারা এ্যারেস্ট এড়িয়ে যাচ্ছে কেমন করে?

এখনো অবধি এর মানে বুঝতে পারিনি আমরা। ব্যাপার ধরা পড়বে আমাদের কাছে শিগ্গির। মিস্ট্রি আছে।

কিন্তু শুনেছি, আপনাদের সভায় সিদ্ধান্ত হলেই তবে এ্যাকশান হয়।

হয়। এক্ষেত্রেও হয়েছে। তবে এসব ব্যাপারে লোক্যাল ইউনিটই ডিসিসান নেয়। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বটতলা ইউনিট। আর ঐ ইউনিটে ভেজাল ক্যাডার বেশি হয়ে গেছিল। তাদের এমন তড়িঘড়ি এ্যাকশান করাব সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে এটা ঠিক, আজ না হলেও মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই এমন এ্যাকশান নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পাবত। আমাদের আরও কিছু সাংগঠনিক শক্তি সংহত করার দরকার ছিল। হাতিয়াবের প্রশ্নেও আরো শক্তিশালী হতে পারতাম আমরা।

বাইরের লোক আপনাদের পার্টিতে বাজে লোকজন ঢুকিয়ে দিতে পারে এটা কেমন করে সম্ভব? যতদূর জানি, আপনাদের পার্টি-সংগঠন অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। বাজে লোকজন অনুপ্রবেশ করল কী করে, মতবাদে বিশ্বাস না থাকলে?

সংগঠন যে স্তরে আছে, তাতে সব সময়ে এ্যাকশানের ক্ষেত্রে চুলচেরা ক্যাডার-বাছাই কৌশলগত প্রকরণের দিক দিয়ে ভ্রান্ত। পার্টির নির্দেশ, লাল-সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে। তার জন্যে মার্কসীয় ব্যাকরণে যাদের লুম্পেন প্রলেটারিয়েট বলা হয়, বর্তমান অবস্থায়

তাদেব কাজে লাগানো দবকাব। সংগ্রামেব মধ্যে দিয়ে এদের থেকে কিছু কিছু মিলিট্যাণ্ট্ এলিমেণ্ট্—

চা এসে গেল।

নিন, খান।

আপনাবা?

দবকাব নেই এখন। কমবেড, তুমি শেয়াব কববে?

ঘাড় নাড়ল তরুণী। বলল: আমাব কিছু জরুবী কথা ছিল কমবেড। মেসেজ আছে।

খুব জরুবী?

খুব জরুবী।

একটু অপেক্ষা করুন, অ্যাঁ। আসছি। ততক্ষণ আপনি এই হ্যাণ্ড-আউটটা পড়তে পারেন। একখানা কাগজ দিয়ে আমাকে বসিয়ে রেখেই বেরিয়ে গেলেন ওঁরা। দ্বাবেব প্রহবীদেবও দেখলাম না আব। চা-টুকু শেষ কবতে কবতে সাইক্লো হ্যাণ্ড-আউট পড়তে লাগলাম।

নাতিদীর্ঘ কৈফিয়ৎ, কেন মিলন চৌধুবীকে খুন কবা হল।

চেয়াবম্যানেব চিন্তাধাবাব আলোকে চৌধুবীব শ্রেণীচবিত্রকে বিশ্লেষণ কবে দেখা গেছে কৃষি-বিপ্লবেব স্বার্থেব শত্রু সে। এ অঞ্চলে যে দৃঢ় পার্টি-সংগঠন গড়ে উঠেছে তাব পেছনে আমাদেব অগণিত কমবেডেব আত্মত্যাগ বয়েছে। সাম্রাজ্যবাদেব মুৎসুদ্দি আব বুর্জোয়াদেব ছদ্মবেশী চব নয়া সংশোধনবাদীবা বাববাব এখানকাব দুর্গ ভাঙাব চেষ্টা কবেছে। অন্ততঃ দশজন কমবেড প্রাণ দিয়েছে এই আক্রমণ প্রতিবোধেব জন্য। তখনকাব মত আত্মবক্ষাব খাতিবে প্রতিক্রিয়াশীল মিলন চৌধুবীব সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। কিন্তু অবস্থাব পবিবর্তন ঘটেছে। এ অঞ্চলে নয়া সংশোধনবাদীবা ঘায়েল হয়েছে। আমাদেব দুর্গ অনেক শক্তিশালী হয়েছে। সুতবাং প্রতিক্রিয়াব সঙ্গে এবাবে মুখোমুখি লড়াই সুরু কবছি আমবা। মিলন চৌধুবীকে দিয়ে

তার সূত্রপাত করেছি। কোন ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ কাজ কারো উপকার করতে পারে। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের দিক থেকে তেমন কাজ ক্ষতিকর। কেননা এমন উপকারে শ্রেণীচেতনা রুদ্ধ হয়। অতএব জনসাধারণ আমাদের কাজকে যেন বৃহত্তর সংগ্রামের পটভূমিকাতে বিচার করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের কৈফিয়ৎ দিতে কোনদিন কুণ্ঠাবোধ করিনি, করব না।

হ্যাণ্ড-আউটটা পড়ে কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। নেতার বক্তব্যের সঙ্গে কোথায় যেন গরমিল।

নেতা একা ফিরে এলেন। হাসিমুখে বললেন, পড়েছেন ?

পড়েছি। কিন্তু আপনার কথার সঙ্গে তো মিলছে না।

আপনি বলছেন, আমি ট্যাকটিক্যাল ব্লাণ্ডার বলে এ্যাকশানটাকে অভিহিত করেছি এই তো ?

ঠিক তাই।

ওটা আমাদের আত্মসমালোচনা। জনসাধারণকে সব কথা জানাবার সময় এখনো আসেনি।

আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন প্রতিহিংসার যে উন্মত্ত তাণ্ডব চলছে তা আপনাদের এই দুর্গে আঘাত করবে না ? এটা কি অক্ষত থাকবে ?

রাখার জন্যে লড়ব আমরা, প্রাণ দেব। ফল কী হবে তা নির্ভর করছে কার প্রয়োগ ক্ষমতা কতটা তার ওপর। তবে আমাদের দৃষ্টান্ত আর সবাইকে কৃষিবিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা দেবে।

স্পষ্টই বলছি, আপনাদের ঐ কৃষিবিপ্লবের কার্যধারা বুঝতে পারি না আমি।

কেন ? কী অসুবিধে হয় বুঝতে ?

কৃষিবিপ্লব তো গ্রামেই হবার কথা। শহরে খতম অভিযান করে আর ব্যক্তিসন্ত্রাস ছড়িয়ে কেমন করে একাজ এগোচ্ছে ?

এটা একটা পুরোনো প্রশ্ন। আমাদের মুখপত্রের পঞ্চম সংখ্যায়

এস্‌-জি অর্থাৎ সেক্রেটারী-জেনারেল ভিৎ ও ইমারৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন শহরের এ্যাকশান কেমন করে গ্রামের কৃষিবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবে। এছাড়া পার্টির জঙ্গীচরিত্র গড়ে ওঠার জন্যেও এ্যাকশান প্রয়োজনীয়।

ঠিক বুঝলাম না। আপনাদের আসল লড়াই যাদের নিয়ে অর্থাৎ সবহারা কৃষকশ্রেণী, তাদেরই তো জঙ্গী চরিত্র গড়ে ওঠা দরকার। কিন্তু শহরে এ্যাকশান বাড়ছে আপনাদের, গ্রামের এ্যাকশান ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

কমে যাচ্ছে বুঝলেন কী করে?

খবরই দেখি না।

বুর্জোয়া সংবাদপত্র তো ওসব খবর দেবে না। আমাদের মুখপত্র পড়লে জানতে পারবেন গ্রামের লড়াই কতখানি এগিয়েছে।

চুপ করে গেলাম। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলতে হবে। জানতে পেরেছি, কেন এই হিসাব উৎসব সুরু হয়েছে। শুধু একটা মস্তবড় প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে এসব কিছুর পেছনে যেন কোথা থেকে একটা অদৃশ্য জাল এসে পড়েছে। মিলন চৌধুরীকে খতম করেছে যারা তারা কেমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রকাশ্য রাজপথে, বুক ফুলিয়ে? এদের ট্যাক্‌টিক্যাল ব্লাণ্ডার কি কারো অলক্ষ্য প্ররোচনার ফল? বুঝি এক ঢিলে দুই পাখী মারার একটা সাজানো চাতুরী কাজ হাসিল করেছে একে একে। কেউ মিলন চৌধুরীকে সরাতে চেয়েছে, আবার এদেরও মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছে?

যদি তাই হয় তবে সে রহস্যের আভাস কোথায় পাব?

নেতা বলে চলেছেন কেমন করে কোন জেলায় কাজ এগিয়ে চলেছে। কতজন জোতদার-মহাজন খতম হয়েছে।

সবই বুঝলাম। কিন্তু আমার নিজের মনে হয়, আপনারা সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে ভুল করছেন। বলে ফেললাম ভরসা করে। এতে ক্ষতি হবে আপনাদের।

কেমনভাবে তাদের ব্যবহার করব, রাজনীতি শেখাব তার ওপরেই নির্ভর করছে সেটা। ওদের আমরা সমাজবিরোধী বলতে চাই না। বর্তমান সমাজব্যবস্থার শিকার ওরা। মনস্তাত্বিক রূপান্তর ঘটাতে পারলে ওদের মধ্যে থেকেই অনেক বিপ্লবীর জন্ম হবে।

কামনা করব, যেন তাই হয়। তবে এখানকার যে ধারণা নিয়ে ফিরব আমি, তার মধ্যে সমাজবিরোধী শক্তির বিশ্বাসহীনতার মাঝে যে আপনারা কত অসহায় এই উপলব্ধি অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকবে।

ভুল করছেন, আপনি মস্ত ভুল করছেন।

হয়তো ভুলই করছি। কিন্তু সে ভুল ভেঙ্গে দিন দৃষ্টান্ত দিয়ে। দেখান, সত্যি অসহায় নন আপনারা। পথে যে এসেছি, আপনাদের যে দু-একজন কর্মীর সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁরা অবশ্যই ভাবী উঁচু নৈতিকতার অধিকারী। কিন্তু আর যাদের কথা বললাম তাদের বেশীর ভাগ নীতি আদর্শের ধার ধারে না। রক্তের নেশা আর প্রচলিত আইনশৃঙ্খলাকে স্বেচ্ছাচারের বন্যায় বইয়ে বানচাল করার প্রবৃত্তি—এই দু'য়ের বশে তারা এ্যাকশান করছে।

এটা আপনি বলছেন আগে থেকে তৈরা ধারণা নিয়ে। আমাদের বিশ্লেষণ অন্যরকম। একটু উষ্মা প্রকাশ করলেন নেতা, —বুর্জোয়া মনোবৃত্তি হল রক্ষণশীল। সেই ধরণের কথা শুনছি আপনার কাছে।

আপনি রাগ করছেন। যাই হোক, ও প্রশ্নটা ঘটনার ধারায় পরীক্ষিত হবার জন্যে এখনকার মত তোলা থাক। আপাতত যে খবর আমার দরকার, তা পেয়ে গেছি। এবারে যদি আমাকে যেতে দেন।

আপনি যেতে পারেন। আমাদের এখানকার ব্যাপারটা যথাযথ-ভাবে প্রকাশ পাবে আশা করতে পারি।

নিশ্চয়ই। আচ্ছা এ বাড়ীটা তো দেখাছ নতুন।

এটাই আমাদের হেডকোয়ার্টার আপাতত। ছিল একজন

পুলিশ অফিসারের বাড়ী। প্রাণের ভয়ে তিনি এ এলাকা ছেড়েছেন অনেকদিন আগেই। দিনের বেলায় এলে দেখতে পেতেন, বাইরে বড় বড় করে লিখে দিয়েছি আমরা—মেহনতী মানুষের রক্তজল করা পয়সা লুঠ করে এক পুলিশ অফিসার বাড়ী বানিয়েছিল, সেই বাড়ী মেহনতী মানুষের পার্টির কাজে লাগছে।

তথ্য নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। বললাম, বাঃ!

হ্যা। এর থেকেই জনগণের শত্রুরা বুঝবে, লুণ্ঠন করা ভোগের সামগ্রী আমরা ক্ষমতা দখল করার পরে এইভাবে কেড়ে নেব। এই তথ্য আপনার রিপোর্টে দিতে ভুলবেন না যেন।

ভুলব না।

আর আমাদের মুক্ত অঞ্চল কীভাবে চালাই সেটাও লিখে দিতে পারেন। শুনবেন?

শুনতে ক্ষতি নেই। বলুন না।

এ অঞ্চল বা তার আশপাশের সব অবস্থাপন্ন লোককে পার্টি-লেভি দিতে হয়। সাধারণ লোকেরাও মিনিমাম লেভি দেয়। এ ছাড়াও পার্টি-ক্যাডারদের খাওয়া-থাকা পালা করে প্রতি বাড়ীতেই ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় ছেলেদের ট্রেনিং দিই আমরা, ক্লাস নিই। রাজনীতি শেখাই। ছোটবড় সবাইকেই আমরা চেয়ারম্যানের শিক্ষায় সমৃদ্ধ করে তুলছি। এই অঞ্চলটাই হয়ে উঠবে আদর্শ গ্রবিবিপ্লবের পীঠস্থান।

অনেক কিছুই জানতে পারলাম আপনার কাছ থেকে। যদি অনুমতি করেন, আপনাদের দু-একটা ছবি নিতে পারি?

ছবি হবার মত গুরুত্ব অর্জন করেছি বলে মনে করি না। দরকার কী এ সবের?

আপনার যখন আপত্তি তখন সম্ভব হচ্ছে না। তবে এর একটা প্রচারমূল্যও ছিল।

না। এমন প্রচারে কোন ব্যক্তিবিশেষকে গুরুত্ব দেয়। ব্যক্তি-

কেন্দ্রিক প্রচারে আপাতত আমাদের দরকার নেই। হাত তুললেন নেতা, বললেন, আপনাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি।

সেই সময়ে সেই তরুণী এসে পড়লেন আবার। রীতিমত বিচলিত, ব্যস্তসমস্ত ভাব।

কমরেড্!

বলুন।

আমার দিকে চাইলেন তরুণী। বোধহয় গোপন কিছু জানাবার আছে। তাই সংকোচ।

আপনি যে খবর দেবেন, তা এর কাছে প্রকাশ পেলে ক্ষতি নেই। বলতে পারেন।

আমাদের ডিফেন্স লাইন ঠিক আছে। কিন্তু

কিন্তু কী?

খবর এসেছে, আর ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই অপারেশান শুরু করবে ওরা।

আমরা তৈরী আছি, না কি?

আছি। তবে-

তবে?

এখানেও স্যাবোটাজ হবে, আশঙ্কা করছি

সে কি!

উঠে দাঁড়ালেন নেতা।

কমরেড জি-কে চাই এখুনি। ডাকুন। আর হ্যা, একে নিরাপদে আমাদের এলাকার বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কোঅর্ডিনেশান-কভার বন্দোবস্ত করে ফেলুন।

মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেলেন তরুণী

আমার কেমন যেন মনে পড়ছিল কোন কোন ঐতিহাসিক নাটকের দৃশ্য বিশেষ। আন্দাজ করতে পারছিলাম না যে সমস্ত

ঘটনার ঘুর্ণাবর্ত টেনে এনেছে আমাকে এখানে, তা কোনকালে তেমন ঐতিহাসিক নাটকের কোন-না-কোন দৃশ্যের উপজীব্য হবে কি না।

মাথা নীচু করে রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলে আঙুল বোলাচ্ছেন নেতা, কোন বিপর্যস্ত শাহজাদার মত।

আপনি যাবেন, যান। যদি পারেন, আশেপাশে থাকবেন অনুরোধ করব। হঠাৎ বললেন নেতা।

কেন বলুন তো ?

অন্ততঃ খানিকটা পরিচয় পাবেন আমাদের আদর্শনিষ্ঠার। না, সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নয় এটা। আপনারা রিপোর্টাররা অনেক সময়েই বিরাট গুরুদায়িত্ব নীরবে পালন করেন। এও এক পরম দায়িত্ব। ভারতের সর্বহারা শ্রেণীর প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের এক পর্বের প্রচণ্ডতার সাক্ষ্য বহন করবে আপনার রিপোর্ট। তবে দেখবেন, হয়তো শেষ হয়ে যাব আমরা কিন্তু বিপ্লবের লাল পতাকায় স্বাক্ষর রাখব আমাদের বুকের তাজা রক্তের। আপনার রিপোর্ট লেখার আগে অবধি যদি সেই পর্বকে চোখের সামনে দেখেন তবে তাও নিশ্চয়ই বাদ যাবে না এ আশাও করব আপনার কাছে।

আপনার অনুরোধ রাখবার চেষ্টা করব অবশ্যই, যদি কোন সুযোগ ঘটে।

তিনজন ঘরে এসে ঢুকলেন। সেই তরুণী এবং আরও দু'জন।

আপনি এর সঙ্গে যাবেন। তরুণী দেখিয়ে দিলেন একজনকে।

আচ্ছা আসি, নমস্কার।

বিপ্লবী অভিনন্দন। বললেন নেতা।

বেরিয়ে পড়লাম নতুন সঙ্গীর পিছু পিছু।

রাস্তায় এসে অন্য পথ ধরল আমার এবারকার পথপ্রদর্শক। মনে হয় না সে কৈশোর একেবারে পেরিয়েছে বলে। পনেরো বছর হবে কিনা সন্দেহ। চোখে-মুখে একটা ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করেছিলাম হ্যারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোতে।

একটুখানি হেঁটেই বললাম, এ পথে আসিনি তো।

জানি না কোন পথে এসেছিলেন। তবে যেখান দিয়ে আপনাকে পৌঁছে দেবার কথা সেদিকেই চলেছি। ভয় নেই।

আশ্বাস মিলল কচি কচি গলায়।

আর কোন কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। আশপাশ দিয়ে মাঝে মাঝে দু-একজন করে যাতায়াত করছে। আমার সঙ্গীকে দেখেই কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলের মধ্যেই মনে হচ্ছে বেশ চাঞ্চল্য। দু-চারটে কথাবার্তাও যা কানে আসছে, তাতে বুঝছি, চারদিক দিয়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করার প্রস্তুতি চলছে। আবার আলগা-আলগা বেসুরো কথা শুনছি মাঝে মাঝে। তাতে কেমন যেন চাপা উল্লাস, উত্তেজনা নেই। হয়তো এদের এই দুর্গের মধ্যেও ফাটল দেখা দিয়েছে জায়গায় জায়গায়। স্যাবোটাজের খবরটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

অনেক লোক পার হলাম, অনেক ঘাঁটি কাটিয়ে চলে এলাম আমরা। বস্তিগুলো ছাড়িয়ে একটা ধূ ধূ মাঠের পথ ধরেছি।

পা তুলে আসবেন। কোন কিছু আটকে গেলে যেন টানাটানি করতে যাবেন না, আমাকে বলবেন। কেমন? সঙ্গী নির্দেশ দিল আমায়।

এবারে নির্জন পথ। মনে হচ্ছে হাঁটতে হবে অনেকটা। আজকের বিকেল থেকে যে জগতের ভয়াবহ রূপটা কল্পনায় আমাকে নিরন্তর পীড়া দিয়েছে সেই জগতকে যেন ফেলে এলাম নিরুদ্বেগে, অবহেলায়। বুঝতেই পারছি না কোথায় গিয়ে শেষ অবধি পৌঁছে দেবে আমাকে-

আচ্ছা ভাই, কতটা হাঁটতে হবে আর?

একটু হাঁটতে হবে। অনেকটা দূর দিয়ে ঘুরে আসছি আমরা।

এতটা ঘুরতে গেলে কেন শুধু শুধু?

হাঁটতে আপনার কষ্ট হচ্ছে বোধহয়?

তা একটু হচ্ছে। অস্বীকার করে লাভ নেই।

কী করব বলুন, আমার ওপর নির্দেশ আছে এ পথ দিয়ে আপনাকে পৌঁছে দেওয়ার।

তোমার নাম কি ভাই? ব্যক্তিগত আলাপ করতে ইচ্ছে করছিল।

আমার নাম অনুপম। অনুপম সরকার।

তুমি পড়াশোনা কর না?

করতাম। এখন করি না।

কী পড়তে?

প্রেসিডেন্সীতে ফার্স্ট ইয়ারে ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে।

পড়া ছেড়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ?

কেন ছাড়লে?

বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থায় আমলা তৈরী হয়। তারা শুধু হুকুম তামিল করে যায়। মানুষের জন্যে কিচ্ছু করে না। তেমন অমানুষ হতে চাই না বলে।

কিন্তু সে ব্যবস্থা দেশের অধিকাংশ মানুষকে মেনে নিতে হচ্ছে।

একদিন তা আর মেনে নেবে না। দেখবেন, এর কোন দামই থাকবে না।

তর্ক নিরর্থক। তাই চুপ করে গেলাম। অনুপম নিজের থেকেই বলল, বিবলদা কত ভালো স্কলার ছিল জানেন?

না, জানি না।

অনায়াসে ফার্স্ট হয়েছিল কেমিস্ট্রিতে। এম্. এস. সি. পড়তে পড়তেই ছেড়ে দিল। ও যদি নিজে বুঝতে না পারত, চেয়ারম্যানের শিক্ষা যদি ও না পেত, তাহলে বড় জোর একটা চাকরি পেত। কিন্তু সেবা করতে হত শোষক শ্রেণীকে, দেশকে বা মানুষকে কী দিতে পারত?

চুপ করে শুনলাম অনুপমের কথা।

ঐ তো যাকে দেখলেন আপনি মানে রত্নাদিকে—ও ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস। কতই বা বয়েস? ওরও মোহভঙ্গ ঘটেছে।

কিন্তু অনুপম, সবই বুঝলাম। একটা কথা থেকে যাচ্ছে। কথাটা হল, তোমরা যে পথে নামলে এপথে লড়াই করে টিকতে পারবে? মাস সাপোর্টের ব্যাপার আছে না?

ও কথাটা যাই থাক, আমাদের লড়াই করার কথা। তাতে বাঁচি বা মরি যায় আসে না কিছু।

এমন অনর্থক প্রাণ দিয়ে লাভ কি অনুপম?

অনর্থক বলছেন কেন? প্রাণ দিয়ে চেয়ারম্যানের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিয়ে যাব। বোধহয় একটু হাসিও ফুটল অনুপমের মুখে, অন্ধকারে দেখতে পেলাম না। আমরা বলি, যেখানে পারো স্ফুলিঙ্গ হয়ে দেখা দাও, জ্বলে ওঠো। আজ হয়তো নিবিয়ে দেবে তোমায় কিন্তু ধিকি ধিকি তুষের আগুনের মতই তা চাপা থাকবে। প্রাণের আগুন কখনো নেবে না। সেই আগুন একদিন সারা দেশের মানুষের বুকে এক সাথে জ্বলে উঠে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

বুঝলাম ব্যক্তিগত আলাপ কোন দিকে যাচ্ছে। এসব বহুশ্রুত বহুকথিত তত্ত্ব ঠিক ভাল লাগছিল না।

তবু অনুপমের কথাগুলোর উত্তাপ স্পর্শ করল আমাকে।

যে মানুষটা প্রাণ দিয়ে কোন কিছুকে নিঃস্বার্থভাবে বিশ্বাস করে তার জন্যে সর্বকিছু অবহেলায় বিসর্জন দিয়ে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়—তার মধ্যে হঠকারিতা বলি আর নির্বুদ্ধিতাই বলি যাই থাকুক না কেন, সে কারো না কারো অন্তরে ঘা দিতে পারে। এই কালে কী তার প্রাপ্য জানি না। শ্রদ্ধা, অনুকম্পা না সহানুভূতি?

অনুপমের জন্যে তখন কী ভাব মনে জেগেছিল খেয়াল নেই। কোথায় যেন হিসেবের গরমিল। এত মেধা, এত তেজ, এত কর্মশক্তি ধ্বংস নিশ্চিত জেনেও কেনই বা নিষ্ফল বিলুপ্তি বরণ করবে।

আর তার সঙ্গী কে? স্বভাব অপরাধী নিষ্ঠুর নির্মম কতকগুলো অপচিত শক্তি। যার অধিকাংশ কাঞ্চনমূল্যে অতি সহজেই শত্রু হয়ে যাচ্ছে।

এদেশের ভাগ্যবিধাতা কার কোন অপরাধে এত হৃদয়হীন নিবন্ধ রচনা করেছেন, ইতিহাসে তার ইঙ্গিত হয়তো মিলবে, কিন্তু তা উত্তর-কালে। এ-কাল এমন বিসদৃশ অসম মেল বন্ধনে বিমূঢ়।

কোন সময়ে যেন প্রান্তর পার হয়ে রেললাইনের ধার দিয়ে হাটতে শুরু করেছি দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে অনুপম। তার পিছু পিছু অনেকটা তফাতে ক্লান্ত পায়ে পায়ে কোনমতে চলছি।

হঠাৎ সামনে দেখা দিল কয়েকটা ছায়ামূর্তি। মনে হয়, ওরা গা-ঢাকা দিয়ে লাইনের পাশে কোন অন্তরালে ছিল। মানুষ দেখেই বেরিয়ে এসেছে।

কাছাকাছি হতেই ঘিরে দাঁড়াল ছায়ামূর্তিকটা

কোথায় যাচ্ছে! ওদের মধ্যে একজন যেন বাতাসকে জিজ্ঞাসা করল।

পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল অনুপম, জবাব না দিয়েই পথ আটকে দাঁড়াল ওরা।

জবাব চাই।

কোন জবাবই দিল না অনুপম কত চটপট ওর হাত চলে বুঝতে দিল না কাউকে। দু-দুটো আওয়াজ পরপর বাতাস ভেদ করে ফাঁকা রেললাইনের ওপর দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। পুতুলের মত দুটো আকৃতি পড়ে গেল মাটিতে। আর যারা ছিল, বোধহয় তিনজন হবে, পরিত্রাহি দৌড়ে পালিয়ে গেল।

চলে আসুন। অনুপমের নিষ্কম্প গলা কানে এল।

দেহ-দুটোকে ডিঙ্গিয়ে পিছু নিলাম । যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব নিয়ে আগের মতই হাঁটতে লাগল ও

ওরা বুঝতে পারেনি, আমার কাছে আছে। ফালতু পথ আটকাল।

কারা, ওরা ?

একটা ডেন আছে এখানে। ভাটিখানা। চোলাই তৈরী করে। এদের একটা গ্যাং আছে, যারা এর সঙ্গে অন্য নানা নোংরা কাজ করে। ওয়াগন ভাঙে, ছিনতাই করে। ওদের তাল ছিল ছিনতাই করা। তাই একেবারে সাফ করে দিলাম।

কিন্তু তুমি এপথে ফিরবে তো ?

না। ফিরব অন্য পথে। তবে এ পথে ফিরলেই বা কী ? দারুণ ভীতু ওরা।

লোক-দুটো কি খতম হল ?

কী জানি ? না হওয়ারই কথা। জখম হয়ে পড়ে আছে। চিনতে পারলে হয়তো ঝামেলা করত না। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, এমন অবস্থায় পরিচয় জানানো ঠিক নয়। সেইজন্যেই দু-দুটো কার্টিজ নষ্ট হল। উপায় নেই। আপনাকে পৌছে দিতে হবে।

এ পথে আসিনি কখনো, মনে হচ্ছে। কোথায় পৌছে দেবে ?

ঠিক যে রাস্তায় সোজা গেলে নিরাপদ জায়গায় পৌছঁবেন।

কিন্তু আমি যে শ্রীনাথবাবু রোডে যেতে চাই।

চলে যাবেন খোঁজাখুঁজি করে। যে রাস্তা দেখাব, সেই পাড়ায় দেখবেন, দলবল সব টহল দিচ্ছে।

কেন ? টহল দেবে কেন ? সব পাড়ায়ই কি একই অবস্থা ?

প্রায় ? তবে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই।

কেন ?

ওরা আমাদের লোক ছাড়া আর কাউকে কিছু করবে না।

সান্ত্বনা দিচ্ছে অনুপম, বুঝলাম। আর কীই বা বলবে ? ও জানে বোধহয় আমার সত্যিকারের পরিচয় কী। কিন্তু জানে না আর কেউ তা জানতে পারলে পরিণতি ভাল নাও হতে পারে।

একটা রেলব্রিজের পাশ দিয়ে বড় রাস্তা। দূর থেকেই আমায় সেটা দেখিয়ে দিল অনুপম। দিয়ে বলল:

• দেখতেই পাচ্ছেন, অমন সদর রাস্তায় গিয়ে পড়া আমার পক্ষে ঠিক হবে না। আমি ফিরে যাচ্ছি। ঐ রাস্তা ধরে এগিয়ে যান, ডানদিকে যে গলিটা পড়বে সেইখানে নিশ্চিত লোকজন দেখতে পাবেন এখনও। এখানে লোকেরা রাত জেগে পাহারা দেয়। আপনার পক্ষে নিরাপদ।

বিদায় জানালাম ওকে। মুঠোর মধ্যে জীবন্ত হাত একখানা অনুভব করলাম। আর কোন কথা বলা বা দেরী করার কোন সুযোগ না দিয়েই পিছু ফিরে বাঁদিকে ঘুরল অনুপম। অন্ধকারে ঝোপ-গাছপালা-জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ওর আকৃতিটা।

রাস্তায় এসে ডানদিকের প্রথম গলিটায় ঢুকে পড়লাম। সদর রাস্তায় আলো রয়েছে, কিন্তু গলির মধ্যে অন্ধকার। আন্দাজে যতটা বুঝলাম, নতুন উপনিবেশ এটা। হাল্কা হাল্কা আধুনিক গড়নের সব ঘরবাড়ী, একটু একটু ফাঁক রেখেই তৈরী হয়েছে। খুব একটা ঘিঞ্জি নয়। এক-আধটু ফাকা জায়গাও রাস্তার পাশে পাশে ঠাওর করছি।

কিন্তু কোন লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। পাহারায় কেউ থাকে কি না বুঝতে পারলাম না। বরাবর খানিক গিয়ে মনে হল গলিটা বাঁক নিয়েছে। সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতেই কানে কিছু কিছু কথাবার্তা এল। মানুষ আসছে কয়েকজন এই পথে। একটু উৎসাহিত হয়েই এগিয়ে চললাম।

একটু পরেই যেন তিন-চারজনকে দেখলাম বাঁক ঘুরে আমার সামনা-সামনি হতে। আমাকেও দেখে ফেলল ওরা। পলকের মধ্যেই একটা ভীতি পেয়ে বসল আমায়। উৎসাহ যেটুকু পেয়েছিলাম, নিবে গেল। কাল বিকেলে যে মুহূর্তে এই অঞ্চলের কোন একখানে পা দিয়েছি, সেই মুহূর্তেই দলবদ্ধ মানুষ যেন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে।

হাঁটুনির গতি ধীর হয়ে গেছে, যেন এগিয়ে যেতে উৎসাহ পাচ্ছি না। কী পরিচয় দেব, এত রাতে এই অচেনা এলাকায় এমনভাবে যাওয়ার কী কৈফিয়ৎ হতে পারে, ঝটিতি ভাবতে পারলাম না। যেন শামুকের মত গুটিগুটি এগোচ্ছি। কেন না পিছু ফেরায় বিপদ বেশি, এইটুকু সচেতনতা আমাকে জোর করে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

এরা কারা? কোন দল? আমাকে কীভাবে গ্রহণ করবে?

হঠাৎ দেখলাম, আমাকে অবাক করে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল দলটা। তাহলে কি আমিও দাঁড়িয়ে যাব? হয়তো কিছুটা ব্যবধান হু'তরফেরই কাম্য।

হোক, এগিয়ে যাবই। বিনা প্রশ্নে যদি কোন আক্রমণের শিকার হতে হয়, উপায় নেই এখন। পিছু হটে যাবই বা কোথায়!

কেউই কথা বলছে না আর। শুধু নিরীক্ষণ আর আন্দাজ করার পালা চলছে। ব্যবধান ক্রমেই কমে কমে যখন মুখোমুখি, একটা প্রশ্ন শুনলাম। গলাটা যেন কেমন কাঁপা কাঁপা।

কোথায় যাবেন?

শ্রীনাথবাবু রোডে।

কোথা থেকে আসছেন? অন্য আর একটা গলা, তাতে বিস্ময়!

অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে আসছি, একজনের খোঁজে।

অকস্মাৎ গল্প মনে পড়ে গেল একটা।

কিন্তু ওদিকে যাবেন না। ওটা ভারী ডেঞ্জারাস এরিয়া।

না গিয়ে উপায় নেই। আর কোথায় যাব এ সময়ে? এক বন্ধুর বাড়ী ওখানে। তাই যাচ্ছি।

দলের কয়েকজনের মধ্যে নীরবে কোন ভাব বিনিময় ঘটে গেল। তারপর কথা সুরু হল।

দেখলি? এমন ড্রেসে একলা-একলা কোন লোককে ডাউট করা যায় না, জানি আমি। শুধু শুধু ঘাবড়ে যাচ্ছিলি তোরা।

তুইও তো ঘাবড়েছিলি বাবা।

বলেছিল তোকে। আমি তো এগিয়ে যাবার জন্যে গা টিপছিলাম। তোরা এগোলি না তো কেউ।

গা টিপছিলে না হাত ধরে টেনে রাখছিলে, ভদ্রলোককে দেখে?

মোটেই নয়।

যাক্‌গে, বাদ দে ও সব কথা। অন্য আর একটা গলা শোনা গেল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তর্ক করতে হবে না ঐ নিয়ে। আমরা সবাই সাহসী বীরপুরুষ। ভদ্রলোককে দেখেই যে চোঁ চোঁ দৌড় লাগাইনি এই যথেষ্ট। এখন বরং শোনা যাক ওঁর পুরো ব্যাপারটা কি। স্কুলঘরটা খুলে বসি আয়। আসুন দাদা।

অনুগমন করতে হল। এমন একটা অবস্থা ভাবতেই পারিনি। একটু যেন স্বস্তি পেলাম এই ভেবে, যে এ তল্লাটে তাহলে সবাই যুদ্ধরত সৈনিক নয়, প্রাণ বাঁচাতে চাওয়া নিরীহ মানুষও আছে।

দু'এক পা গিয়েই রাস্তার পাশে একটা বাড়ীর দরজার তালা খুললেন ওরা। তারপরে ডাকলেন আমাকে ভেতরে যেতে।

আমাদের এখানকার লাইটটাও নেই। সাপ্লাই থেকেই বন্ধ। মোমবাতি জ্বালো। বসুন।

একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন ওরা, বসলাম।

দেশলাই কাঠির ঘায়ে একটা মোমবাতি জ্বলল টেবিলের ওপর।

এইবার আমাকে দেখলেন ওরা। আমিও তাদের আন্দাজ করতে চাইলাম। সংখ্যায় চারজন। হাতে একটা করে সোঁটা বা ব্যাজ আঁটা। তাতে লেখা পল্লী শান্তি কমিটি। অস্ত্র বলতে কিছু থাকার কথা নয়। তবুও তাদের একজনের কাছে একটা বল্লম আর সকলের কাছে একটা করে ব্যাটন-জাতীয়। এটা অবশ্য মেনে নিলাম মনে মনে, স্টেন-পাইপ গান, বোমা-পেটো, বিভলবার-রাইফেলের মেড-ইজি সংস্করণের কাছে বল্লম। ব্যাটন অস্ত্রই নয়। তবে শান্তি কমিটির কাছে বোধহয় এমন অস্ত্রই নিরাপদ

যাই হোক, আলাপ সুরু করলেন ওঁরা।

কোথা থেকে এসেছিলেন ?

বললাম।

এত রাতে ফিরছিলেন, কী ব্যাপার ?

যে গল্পটার সূত্র মনে এনেছিলাম, সেটাই ফেঁদে বসলাম। কেমন করে কত জায়গা ঘুরে 'ভাই'-কে খুঁজে বেড়াচ্ছি বিকেল থেকে। গোলমেলে পাড়ায় ফুটবল ম্যাচ খেলতে এসেছিল এক যোগাযোগে দু-দিন আগে। তারপর থেকে হদিস করতে পারছি না। থানা পুলিশ কোথাও সন্ধান নেই। তাই নানা পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পথ ভুলে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। এখন শ্রীনাথবাবু রোডে এক বন্ধুর বাড়ী আশ্রয় নিতে চাইছি।

নিজের বানিয়ে-নেওয়া গল্পটা নিজের কাছেই বেখাপ্পা লাগছিল। তবুও বিশ্বাস করলেন এঁরা।

যে রাস্তায় যেতে চাইছেন আপনি, সেখানে খোঁজ করেছিলেন? জিজ্ঞাসা করলেন একজন।

না।

ঐদিকেই দারুণ গণ্ডগোল হচ্ছে ঘরবাড়ীগুলো অবধি আছে না মাঠ ময়দান হয়ে গেছে তাই সন্দেহ। খেলতে এসেছিল কোন পাড়ায় ? আর একজন জানতে চাইলেন।

ঠিক বলে যায়নি বাড়ীতে। তবে এদিকে আসছে বলেছিল।

খুব ভাবনার কথা। কেন না খুব খুনখারাপি, বোমাবাজি হচ্ছে ঐদিকটায়। প্রথমজন বললেন।

তাই নাকি ? যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

হ্যাঁ। বিশেষ করে এত রাত্তিরে যাবেন না। হিতাকাঙ্ক্ষীর মত তৃতীয়জন বললেন।

কতটা রাস্তা হবে এখান থেকে ? জিজ্ঞাসা করলাম।

ভেতর দিয়ে চলে যাবেন, আধঘণ্টাও লাগবে না। কিন্তু যাবেন কী করে ? প্রথমজন প্রশ্ন করলেন।

ঠিক চলে যাব, কিচ্ছু হবে না।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন ওঁরা। আমার এমন নিশ্চিন্ত আত্মপ্রত্যয় যে কতদূর ভ্রান্ত তা বোঝাতে দ্বিধা করছেন ভদ্রলোকেরা, তা স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম। একটু ইতস্ততঃ করেই বললেন একজন, যাঁর বাড়ীতে যাবেন, তিনি পাড়া ছেড়ে যাননি তো? গেলে তাঁকে পাবেন তো?

পাব, নিশ্চয়ই পাব।

মনে হয় না পাবেন বলে। ওখানকার অনেক লোক সরে গেছে ঐ সব গণ্ডগোলের জন্যে। বাড়ীতে তালাচাবি দিয়ে অন্য আত্মীয়-স্বজনের কাছে শেল্‌টার নিয়েছে।

তা নিতে পারে। কিন্তু যার কথা বলছি সে যায়নি।

কী জানি হতে পারে। তবে আমরা যতদূর জানি—একজনের কথা চাপা দিলেন আর একজন।

জানি মানে? দেখছি, ঐ তো ডালু চৌধুরী খুন হবার পর থেকেই সুরু হয়েছে গণ্ডগোল। আপনি জানেন না বোধহয়। কেউ ঘেঁষতে পারছে না। পুলিশ অবধি ঘায়েল হয়ে গেছে। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। অজানা-অচেনা লোক হলে আরো ভয়। চট্‌ করে মেরে দেবে।

কিন্তু যেতেই হবে আমায়। আপনারা দয়া করে পথটা বলে দিন একটু।

পথ বলে দেওয়া তো আর বড় কথা নয়। তবে এই ক'টা ঘণ্টা কাটিয়ে মানে দিনের আলো দেখা দিলে বেরোবেন। বললেন ওঁদের একজন।

তাহলে আমি কী করব এতক্ষণ? খুব ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম পাওয়া দরকার।

এখানেই বিশ্রাম করুন আর কী হবে! ভোরে রওনা হবেন।

কোন কথাই আর মুখে এল না। চুপচাপ বসে রইলাম। ওঁরা

ক'জনে বসে পড়েছিলেন। কেউ হাই তুলছিলেন কেউ বা ঢুলছিলেন। আমারও ঘুম পাচ্ছিল।

আর তাহলে বেরোব না আমরা? নিজেদের মধ্যে আলোচনা স্থরু করলেন একজন।

কী হবে বেরিয়ে? সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। বরং ভোর অবধি এখানে বসে থাকি।

কিন্তু ওদের গ্রুপ তো দেবী করবে আমাদের জন্যে।

বয়ে গেছে। দেখগে শুয়ে পড়েছে তারা।

যাঃ! অতটা ইরেস্‌পন্‌সিবল্‌ নয় ওরা।

না, নয়। দেখা গেছে। ঐ শান্তি কমিটির রাতজাগা ডিউটি শুধু আমাদেব মত বোকাদের ঘাড়ে পড়েছে। উষ্মার সঙ্গে বললেন একজন। কোথায় হয়ে তার ঠিক নেই। ফালতু খালি সাবা রাত রাস্তায় রাস্তায় ঘোরো। সে সব ঝামেলা এখন আর আমাদেব পাড়ায় নেই। যা ছিল ছিল।

এটা একটা কেমন কথা বললি বল্‌ তো? শান্তি কমিটি করেইতো পাড়া থেকে ওসব হুজ্জুতি বন্ধ হল।

শান্তি কমিটি করে, না কচু। আসলে এ পাড়ায় ঠিক শিকড় গাড়তে পারেনি ওরা। তাব ওপর পুলিশ এসে যা ছেকে ছেকে তুলে নিয়ে গেছে, তা'তেই কাবু হয়ে গেল ওদের পার্টি।

ওঁদের কথা শুনতে শুনতেই তন্দ্রা এসে গেছে। কানে ওদেব আলোচনা এসে বাজছে। শুনছি কি শুনছি না। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিদারুণভাবেই বিশ্রাম চাইছে। চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আধবোজা চোখে মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা আলোয় ঘরের মধ্যেকার লোকগুলোর চেহারা মনে হচ্ছে রহস্যময়। ওদের কারো কারো মুখে সিগারেট, বা বিড়ির লালচে জোনাকী দপদপিয়ে উঠছে। হাই তোলার শব্দ শুনছি তার মাঝে।

ধীরে ধীরে একটা স্বপ্নের ঘোর পেয়ে বসল।

যেন একটা শবদেহকে ঘিরে আছে শ্মশানের বন্ধুরা। এ শ্মশানের মাঝে কোন এক দাহের আমি একক সাক্ষী। অথচ চারদিক থেকে আসছে কোলাহল আবার কখনো বা হুংকার। মানুষজন এই শ্মশানের ভূমিখণ্ডকে এক মৃত আর পর্দ-জীবিতের একটা আলাদা জগৎ কিংবা কোন নিষিদ্ধ দ্বীপ বলে পরিত্যাগ করে গেছে। দিয়েছে নির্বাসন।

চাবড়ে চেহারার অস্পষ্ট রেখাচিত্র দেখতে পাচ্ছি। মৃতদেহটাকে খুঁজলাম, পেলাম না। জমাট বাঁধা অন্ধকারের কোন অলক্ষ্যে সে অপেক্ষা করছে জ্বলন্ত চিতার। কিংবা লুকোচুরি খেলছে। হয়তো সে চায় না কেউ দেখুক তার স্থবির হৃৎপিণ্ডটুকু কখন কোন অবসরে আগুনের পরশমণির ছোঁয়া পেয়ে ছাই হয়ে যায়। অথবা এই লুকোচুরি কি এক ধরণের আত্ম-প্রবঞ্চনা? যে মরেছে, রক্তমাংসের দেহে যার অণু-পরমাণুর দ্বন্দ্বে আর কোন উত্তাপ সৃষ্টি হবার উপায় নেই তার এত অহমিকা কেন? চিতা সাজানো, শ্মশানবন্ধুরাও সকলে প্রস্তুত, প্রত্যাশী দর্শক হাজির—তখন আগুনই বা পলাতক হল কী করে? তবে কি শরীর থেকে বিদায়ী আত্মা প্রেতের লীলারঙ্গে মৃতদেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে? বিচলিত হতে চাইছি, চীৎকার করে জানতে চাইছি মৃতদেহের সন্ধান, কর্তব্যভ্রংশের দায়ে কাঠগড়ায় শ্মশানযাত্রীদের অভিযুক্ত করছি—অবচেতন থেকে এতগুলো ক্ষোভ একসঙ্গে গুমরে উঠছে! কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে না কেন? কথা বলতে পারছি না কেন? কোথায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হচ্ছে কী জানি?

জন্মের অঙ্কুর থেকে মৃত্যুর লয় পর্যন্ত কোন না কোন সাক্ষ্য পৃথিবীর বুকে কখনো স্পষ্টতঃ কখনো অগোচরে থেকে যায়। কেউ তার ধার ধারে না। কিন্তু সময় আসে যখন সেই সাক্ষ্যের প্রতিচ্ছবি কোন না কোন অন্তরে খুঁজতে হয়। দেখতে হয় কোন লগনে কোন আবির্ভাব কিংবা অন্তর্ধান। নইলে শূন্যের কোঠায় অভিজ্ঞতা বৃথাই মাথা ঠুকতে চায়, অহেতুক ইতিহাসের শিক্ষা খুঁজে মরতে হয় তাকে

কিন্তু এই শবের শ্মশানযাত্রার সাক্ষী কি আমি একা! হয়তো নয়। এর বাইরে যারা কোলাহল করছে, আপন কাজে অতি ব্যস্ততার অছিলা খুঁজছে কিংবা শবযাত্রার আয়োজন করে কেটে পড়তে চাইছে তাদের অনুপস্থিতিটাই কি চিহ্নিত হবে? একদা আগুন জ্বলেছিল, বাতাস মেলেনি, দাহ্য ছিল না, সুতরাং নিবে গেছে এই অজুহাতেই তারা পরিত্রাণ পেতে পারে তাহলে।

তা পাক। কোন দুঃখ নেই আমার। জানি, যদি কখনো এমন এক শেষকৃত্যের ঘটনা কোথাও লেখা হয়, একমাত্র নীরব দর্শক হিসেবে দায়ী হব আমি। শুধু ঐটুকু। তার বেশি নয়। বড় জোর, এমন সাক্ষ্যের জন্যে গঞ্জনা পেতে হবে। তার খ্যাতি কিংবা যদি কুখ্যাতিই বলা যায়, তাও কি বড় কম? নীরব দর্শকের কোন ভূমিকাই তো নেই। থাকার কথাও নয়। তবুও যদি থেকে যায় তবে তা দর্শকের সৌভাগ্য।

অতএব দেখে যাই, শুধু দেখে যাই। নিছক ভাবাবেগ হোক আর যুক্তিগ্রাহ্য ভাবনা হোক—কেন আমল দেব তাকে?

কিন্তু শবটা যেন অন্তরাল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল, আঙুল দিয়ে আমায় দেখিয়ে কী বলল। চারপাশে দেখলাম, অগণিত মানুষ উৎসুক হয়ে শুনছে ওর কথা। তাদের মুখে-চোখে দেখছি আলোছায়ার মত হরেক ভাবের আনাগোনা। উত্তেজিত হয়েই বলছে মৃতদেহটা, অভিযোগ করছে। প্রাণপণে বলছে আমি মরিনি, তবুও মৃতদেহ বানিয়েছে আমায়। আর মজা দেখতে এসে জুটেছে মাত্র একজন। দুনিয়ার কেউ যখন এল না, সরে রইল দূরে, একা ঐ লোকটাই ফেউ-এর মত লেগেছে পেছনে—কেমন করে জ্যান্ত এক-জনকে মরা বলে পুড়িয়ে দেয় তা দেখতে।

আশ্চর্য! আমি নিজেও এর প্রতিবাদ করতে ভুলে গেলাম। যারা শুনল তারা আগ্রহের সঙ্গেই শুনল। ভাবান্তর হলেও উত্তেজিত হল না। যেন তারাও নীরব শ্রোতা। মঞ্চের অভিনয় দেখছে।

শবের বলা শেষ হলে সে নিজেই চিতায় আশ্রয় নিল। যেন চিতায় জ্বলে ছাই হয়ে যাবার পরেও আরো অনেক জন্মে নতুন করে দেখা দেবার অনন্ত আশা পেল সে কোথা থেকে।

চিতা জ্বলে উঠল। কোথা থেকে লাফিয়ে চলে এল আগুন। দাউ দাউ করে লেলিহান শিখা চারদিকের অনিশ্চয় অন্ধকার ঘুচিয়ে দিল। কিন্তু রাশি রাশি পোকা এল সেই আগুনে খেলা করতে, কাছাকাছি এসে দেহদান করল তারা আগুনের রূপের আভায়। শুধু শুধু কয়েকটা রঙীন প্রজাপতি সেই আলোয় ডানা পেতে লুকোচুরি খেলতে শুরু করল। ওদের মখমল ডানায় চিতার আগুন নানা রঙে বাসা বাধল। একটা বিচিত্র অনুভূতি হল—ঐ নানা রঙের অণু-পরমাণুতে প্রজাপতির ডানায় যেন কয়েক কোটি ভিসুভিয়াসের বীজ বুনে গেল চিতার অগ্নিশিখা।

এই যে, শুনছেন?

গা ধরে নাড়া দিল যেন কেউ আমাকে। চেয়ে দেখলাম ভোরের গোধূলি লজ্জাবতী আলো মেলে দিয়েছে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়ায়। ঘরের মধ্যে টেবিল, কয়েকখানা চেয়ার, আলমারী, দেওয়ালের গায়ে কয়েকজন মহাপুরুষের ছবি সেই আলোর আভাসে আধোফোটা হয়েছে জড়ানো জড়ানো নজরে। চারটে মানুষের আকৃতি থেকে কয়েকঘণ্টা আগেকার রহস্যময়তা নিঃশেষে বিদায় নেয়নি, ছিটেফোঁটা রয়ে গেছে।

এর মধ্যেই ডাকলি কেন ভদ্রলোককে? আর একটু না হয় ঘুমিয়ে নিতেন। খুব টায়ার্ড। ওঁদের মধ্যে থেকেই আপত্তি জানালেন একজন।

বাড়ী ফিরতে হবে না? যিনি ডেকেছিলেন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইলেন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। সোজা হয়ে উঠে পড়লাম। একটু রাস্তাটা দেখিয়ে দিন শুধু। দেরী করব না।

ওঁদের মধ্যে একজন আমাকে এগিয়ে দিতে চললেন। বাকী ক'জন যে যার বাড়ী চলে গেলেন। যেতে যেতে আলাপ-পরিচয় সুরু হল।

কাজকম্ম এখন আর নেই, বেকার। বি. এস-সি. পাশ করে ঐ ওপাড়ার রবার ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতুম। লকআউট করল, ইউনিয়ন স্ট্রাইক ডেকেছিল বলে। বছর ঘুরতে চলল, কোন ফয়শলা হয়নি।

নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে আমার ক্ষণিকের সঙ্গী সরোজ দাস বলছিলেন। বয়েস বেশি নয়, ত্রিশ-বত্রিশ। যে কোন কাজেই উৎসাহী বলে মনে হল।

প্রথম পরিচয়ে বলেছিলাম, ছোটখাট ব্যবসাপাতি করি। কাজেই ধরে বসলেন সরোজবাবু—

দেখুন না দাদা, যদি আপনার ব্যবসায় একটা মুটে-মজুর গোছের লোক হিসেবে একটা হিল্লে হয় আমার। আর পারা যায় না। কত চেষ্টায় যে ফ্যাক্টরীর কাজটা পেয়েছিলুম!

তেমন ব্যবসা করি না। চালিয়ে যাচ্ছি কোনমতে।

সবাই ঐ কথা বলে। তবুও দেখবেন। আপনার নাম ঠিকানা মনে থাকবে। দেখা করব মাঝে মাঝে। বিরক্ত হলেও আমি কিন্তু ছাড়ব না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটলাম দু'জনে। এক সময়ে আপনমনেই বললেন সরোজবাবু:

এ সব হবে না তো কী?

কী সব?

এই যা হচ্ছে—খুন-জখম-খতম।

কেন?

দেখুন না, আবেদন-নিবেদনে কোন কাজ হয় না। আমাদের কারখানার কথাই ধরুন, মালিক লাভ করবে অথচ নানারকম প্যাঁড়া-কল করে লাভ কম দেখাবে। এটা তো করবেই। তাতেই স্ট্রাইক

ডাকলে ইউনিয়ন। ব্যস, অমনি লকআউট। এখন লেবার কমিশনার—অমুক-তমুক করেও কিছু হচ্ছে না। কাজেই ওসব ইউনিয়নবাজী আর হেন-তেন করে লাভ হচ্ছে কী আমাদের? যখন আইনে কায়দা হবে না, মালিকদের দু-চারটেকে সাবাড় করে দাও—যা হয় হোক।

তাতে কি আপনাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে সরোজবাবু?

সমাধান তো কোন কিছুতেই হবে না দাদা। তার চেয়ে বরং মেরে মরি। একটু থেমে নিজেকে শুধরে নিলেন সরোজবাবু, তাই বলে যেন ভাববেন না, আমি ঐ দলের। এটা এমনি বললাম গায়ের জ্বালায়। আপনি ভেবে দেখুন না, ন্যায়বিচার বলে আছে কিছু? যার পয়সা আছে, তার ঐ সব কিছু। আমাদের মত খেটে খাওয়া লোকেদের সব কিছু সয়ে নিতে হচ্ছে। বিচার নেই। যে কোন দিকেই দেখুন না কেন, সেই এক ব্যাপার। আর ঐ যে দু-পয়সা পাইয়ে দেবার পলিটিক্স, আমাদের সর্বনাশ করছে ঐটা।

বুঝলাম, প্রসঙ্গটা গোলমেলে। কোন একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে গেলে এমনি করেই সব জট পাকিয়ে যায়। বলার কথা এত আর এমন এক ধরনের যে আগ্রহই থাকে না।

আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না সরোজবাবু, একটা কথা বলি।

বলুন।

এই যে রাত জেগে আপনারা পাহারা দিচ্ছেন, কেন, বলুন তো?

যাতে কোন রকম অশান্তি আর না হয়।

অশান্তি বলতে কী মনে করছেন আপনারা?

এই যেমন ঐ সব খুন-জখম, দাঙ্গা-হাঙ্গামা—এইসব আর কি! আমাদের পাড়া খুব ডিসটার্বড্ হয়েছিল। এখন অবশ্য আর—

ও সব নেই, এই তো?

হ্যাঁ।

তাহলে এখন আপনারা শান্তিতেই আছেন?

শান্তি আর কই বলুন দাদা? পাড়ায় বেকার বাড়ছে। এতে কী শান্তি থাকে?

তবে আপনাদের এই শান্তি কমিটি কী করছে? শুধু রাত জেগে পাহারা দিলেই কী আর শান্তি আসে?

তাহলে ফের যে কোন সময়ে আবার খুন-জখম ইত্যাদি আরম্ভ হতে পারে।

অশান্তি রয়েছে যখন বলছেন—

তা হবে না।

কেন?

আশপাশে একবার চেয়ে নিলেন সরোজবাবু। তারপরে বললেন:

কী করে আর হবে? পুলিশ ঘোরাঘুরি করে সাদা পোশাকে। খবরাখবর নেয়। কোন ছেলে-ছোকরার বেচাল দেখলেই ওষুধ ধরিয়ে দেয় থানায় নিয়ে গিয়ে। কাজেই কেউ ভরসা করে না।

তাহলে সেই অশান্তি তো থেকেই যাচ্ছে।

তা থাকছে। তবে বুঝে গেছি, ঐ নিয়েই বাঁচতে হবে আমাদের। তার ওপর আবার যদি ঐ সব উৎপাত শুরু হয় তো টিকব কী করে? তবে এ সবও কিছু নয়। আসল ব্যাপার কি জানেন? সারা দেশটায় ক্যানসার হয়ে গেছে। এর চিকিৎসা নেই। শুধু একটু-আধটু যন্ত্রণা কমানো ছাড়া আর কীইবা করার আছে বলুন?

করার অনেক কিছুই আছে, যদি করতে চাই আমরা।

কিছুই নেই, দাদা। চেষ্টা করলেও পারবেন না। এই রকমই চলবে সব কিছু। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সরোজবাবু। সব জেনেশুনেও বোকা সেজে আমরা গড্ডালিকায় ভেসে চলব। ওসব আলোচনা করে লাভ নেই।

অনেকটা পথ চলে এসেছি। কখন কোন অবসরে পুবের আকাশ লাল হয়েছিল, তারপরে হলদে আভায় উজ্জ্বল হয়েছে লক্ষ্য করিনি। চোখদুটো জ্বালা করছিল।

আর যাব না, দাদা। এবারে আসি। মনে রাখবেন আমার কথা। নমস্কার।

পথের নির্দেশ দিয়ে বিদায় নিলেন সরোজবাবু। একা চললাম এবার।

চারদিকে চাইতে চাইতে যাচ্ছিলাম। পাড়া শেষ হয়ে গেছে। বসতি আর নেই বড় একটা। পীচের পাতলা পুলটিসের রাস্তা রূপ নিয়েছে দগদগে ঘা-এর মত খোয়া-সুরকির পথে। সরুও হয়েছে বেশ খানিকটা। দু-পাশে কখনো ঝোপঝাড়, কখনো পড়ো ডাঙা কিংবা কচুরিপানা ঢাকা পুকুর। কেন যে উপনিবেশ এখানে এগিয়ে আসেনি কে জানে?

সর্টকাট রাস্তা এটা, শুধু তাই নয়—নিরাপদও বটে, বলে গেলেন সরোজবাবু। সোজাসুজি এই এক এবং অদ্বিতীয় পথে মিনিট-দশেক হাটলে নাকি মুরারিদেব পাড়া পেয়ে যাব। সে পাড়ায় ঢোকার মত পরিস্থিতি থাকবে কি না জানি না। কিন্তু যেতেই হবে আমাকে। এখনো অনেক কাজ বাকী আর তা শেষ করতে হবে আজকের মধ্যেই। বেশি সময় নিতে চাই না। হয়তো পরিচয় চাপা রাখতে পারব না। এমন ব্যাপারে ঝুঁকি নেওয়া বোকামি।

দেখছি, রোদ উঠছে। লাগছে গাছপালার মাথায়। সাদাটে আকাশ, একটু একটু করে পরিষ্কার নীলের চেহারা নিচ্ছে। দিগন্ত দেখতে বড় ইচ্ছে করছিল, কেন জানি না। কিন্তু চারদিক থেকে এমনভাবে আটকানো যে, নজরের চারদিকে নানারকমের বাধা শুধু ছড়িয়ে পড়ছে, এগিয়ে যাচ্ছে যেন সঙ্গে সঙ্গে। বেঁধে ফেলেছে প্রকৃতিকে তার নিজের নাগপাশে। ঝোপজঙ্গল ছাড়িয়ে কোন কারখানার চিমনীর ধোঁয়া দেখা যায়। বেশ দূর থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনের ভেঁপু শোনা যাচ্ছে। গাছের ফাকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে দূরের আকাশ, শহর-নগরের ওপরের আকাশ। ঝাপসা-ঝাপসা হয়ে আছে। তারি মধ্যে একটু একটু তামাটে ছোপ।

একই আকাশের এমন দু'রকম চেহারা এই প্রথম নজরে পড়ল। দেখলেই যেন বোঝা যায়, কোথায় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে আছে সে— নীচের পৃথিবীর সমস্ত শান্তিটুকু নিঃশেষে পান করেছে, নীল রঙ হারিয়ে ফেলে নীলকণ্ঠ হয়েছে। স্পষ্ট ধরা পড়ে সবুজের অফুরন্ত তেজ কোথায় তাকে নীল সুষমায় নির্বিষ করে রেখেছে।

অদূরে চোখে পড়ল বসতি। খালি খালি বেশ কয়েকখণ্ড জমির পরেই কীসের যেন একটা কারখানা। টিনের শেডগুলো দেখা যাচ্ছে। একটা বয়লার গোছের যন্ত্রের ঘরটা থেকে একটানা শব্দ আসছে। তাহলে কাজ চলছে মনে হয়। কিন্তু লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। গেট কোথায় চোখে পড়ল না। কাঁটাতারের ঘন জাল শালের খুঁটি বসিয়ে টান টান করে বাঁধা। তেমন করেই কারখানাটা ঘেরা।

লোক চাই আমার, যাকে জিজ্ঞাসা করব আমার পথের নির্দেশ। কিন্তু লোক কই? পথের যেদিক দিয়ে চলেছি, সেদিকে হয়তো কোন গেট পড়ে না।

কারখানার সীমানা পার হয়ে কয়েকটা খুপরি খুপরি ঘর। বোধহয় কোয়ার্টার। বাঁশের বেড়ার গায়ে কাদা-লেপা কয়েকখানা ঘর। তার সামনে দিয়েই রাস্তা গেছে। যেতে যেতে দেখলাম প্রায় সব ঘরই তালা দেওয়া। শুধু একখানা ঘরের দরজা ভেতর থেকে ভেজিয়ে দেওয়া, একটু ফাঁক রয়েছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলাম:

এই যে, কে আছ ভাই? বাইরে আসবে একটু?

কোন সাড়া মিলল না। আরও কয়েকবার ডাকলাম। ঘরের সামনে রোয়াকে উঠে দরজার কড়ায় হাত দিতে না দিতেই ভেতর থেকে জলদগম্ভীর প্রশ্ন শোনা গেল:

কৌন্?

বাইরে আসবে একটু

কেয়া হুয়া?

কিছু হয়নি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

একটু পরেই এক বৃদ্ধ দেখা দিল। ভ্রূ কুঁচকে ভাল করে আমাকে দেখে নিল। তারপরে জানতে চাইল, কী চাই।

শ্রীনাথবাবু রোডে যাওয়া যাবে এই পথে?

মালুম নেহি। কিধর সে আতা?

বালিগঞ্জ থেকে আসছি।

কোন্ মতলব ইধর?

পথ ভুল করে এদিকে এসে পড়েছি।

ইয়ে তো আচ্ছা বাত নেহি। কৌন্ রাস্তে বোল্‌তা?

এবার এগাকার নাম বললাম। বলতেই সোজা পেছন ফিরে ঘরে ঢুকে সটান দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা, কোন কথাই আর বলল না।

রোয়াক থেকে নীচে নেমে পড়ে চললাম রাস্তা ধরে। কতকগুলো ঘরবাড়ী দেখা যাচ্ছে। নতুন নতুন সব হাল্কা ধাঁচের বাড়ী। তালা ঝুলছে কয়েকটায়।

লোকজনের সাড়া মিলল এতক্ষণ পরে।

একেবারে রাস্তার ওপরে একখানা ঘর। দরজা খোলা। চোখে পড়ল, জনা-তিনেক লোক বসে আছে ঘরে। কয়েকটা মাদুর দিয়ে মেঝে ঢাকা, তার ওপরে বসে ওরা দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে। মাদুরের ওপরে কয়েকটা ছোট ছোট কাঁচের গ্লাস আর খালি বোতল। কড়া গা-ঘুলোনো বোয়ার গন্ধ দরজার সামনে থেকেই পেলাম।

শ্রীনাথবাবু রোডে যাব, পথ বলে দেবেন?

ওরা তিনজনে যেন চমকে উঠল।

কে দাদা? সোজা হয়ে বসল একজন।

শ্রীনাথবাবু রোডে যাব, মুরারি দত্তের বাড়ী।

কার বাড়ী?

মুরারি দত্তের।

কোত্থেকে আসছেন ?

আসছি অনেক দূর থেকে।

জায়গার নাম নেই নাকি ?

একেবারে প্রথমে যেমন বলেছিলাম সশস্ত্র দলের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তেমন বললাম। ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে ওদের মধ্যে দু'জন।

এদিক দিয়ে আসছেন কেন ?

পথ হারিয়ে ফেলেছি।

রাত থাকতে বেরিয়েছেন নাকি, এ্যাঁ ?

না, মানে—

কথা আটকে যাচ্ছে এবারে। ওরা তো বিশ্বাস করবেই না, যা বলেছি নিজের কাছেই তা নিতান্ত খাপছাড়া লাগছে।

নক্‌শা দিচ্ছেন দাদা ? এতো নিজেই নিজের বিপদ বাঁধাচ্ছেন দেখছি।

ঘর থেকে ওরা দু'জনে বেরিয়ে এসে আমার দু'পাশে দাঁড়াল।

ঝেড়ে কাশো তো চাঁদ। ঐ ব্যাগে কী ?

আর একজন আমার পকেটের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়েছে। টেনে বের করে ফেলল সব। ব্যাগটা নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলছে। বেহাত যাতে না হয় এরজন্যে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেটা আঁকড়ে ধরে আছি।

অত বাতেলা করছিস্ কেন ? দে না ফুটিয়ে।

তৃতীয়জন ঘরের ভেতর থেকে খোলা তরোয়ার একখানা নিয়ে এগিয়ে এল। ছেড়ে দিলাম ব্যাগটা। ওদের একজন পকেটের কাগজপত্র নিয়ে আর একজন ব্যাগ খুলে তার মধ্যেকার কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস বের করে দেখতে লাগল। খোলা তরোয়ার হাতে আর একজন রইল পাহারায়।

এ তো শালা রিপোর্টার মনে হচ্ছে!

আইডেন্টিটি কার্ডটা নিয়ে দেখাদেখি করল ওরা।

• মালকড়ি কী আছে দেখতো।

খোঁজাখুঁজি চলল কিছুক্ষণ। যা ছিল ব্যাগের মধ্যেই পেল ওরা। ডায়েরীর ছেঁড়া পাতাগুলো দেখল বটে কিন্তু কোন খেয়াল করল না কী লেখা আছে না আছে। গুঁজে রেখে দিল আবার। মাইক্রো-ক্যামেরাটাও বের করে দেখল। সেটাও ওদের আটকাল না! নেহাৎ তুচ্ছ বস্তু বলে ব্যাগের মধ্যেই ফেলে দিল।

টাকাকড়িগুলো হাতড়ে ওদের মধ্যে একজন বলল:

রিপোর্ট নিয়ে বেড়াচ্ছে নাকি চাঁদ?

কোন উত্তরই দিলাম না। স্পষ্ট বুঝলাম, কোন ভয় করা উচিত নয় এদের!

জানো, এ চত্বরে এখন রিপোর্টার দেখলেই ফিনিস্ করে দেবার কথা?

দু-তিনজনে এমন নানান্ কথা আমাকে লক্ষ্য করেই বলে চলল কিছুক্ষণ। খোলা তরোয়ার হাতে যে দাঁড়িয়েছিল, উৎকট একটা হাই তুলে শেষ কথা বলে দিল সে—

চ' বাবা, ওদিকে নিয়ে চ'। এত কচকচি ভাল লাগে না। কাজ সেরে দিয়ে আসি।

এদিকে কোন এ্যাকশান চলবে না, হুঁশ নেই সে কথা? গুরু বলেছে কি?

তাহলে বাবা, এ্যাকশানের জায়গায় নিয়ে চ'। শুইয়ে রেখে আসি।

থাম্। মেলা ধড়ফড়াস্নি। বাজিয়ে নিই পার্টিকে। শোয়াবার হলে আধমিনিটও লাগবে না। ভিন্-পাড়ার এ্যাকশান। আনশান ঝামেলা বেঁধে না যায়। তুই ঘরের মধ্যে চলে যা। আমরা দেখছি।

তরোয়ার হাতে লোকটা চলে গেল ঘরের মধ্যে। আশেপাশে

কাউকে দেখছি না আর দেখলেও অবস্থার ইতরবিশেষ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

আমার কাগজপত্র আর ব্যাগটা দিয়ে দিন। চলে যাব আমি।

একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল লোকটা। বাকী দু-জন আমার দিকেই চেয়েছিল এক নজরে। কথা শুনেই লোকটা ভ্রূ কুঁচকে দেখল আমাকে।

কোন কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

তোমাদের কোন কথার জবাব দেব না আমি।

একজন জামার আড়াল থেকে বের করতে যাচ্ছিল একটা কিছু। হাত দিয়ে আটকে দিল লোকটা। চাপা গলায় বলল, সাবাড় হয়ে যাবে এক্ষুনি। যা জানতে চাইছি বল।

যা বলবার বলেছি। দৃঢ়ভাবেই বললাম।

মিথ্যে বলেছ।

ওর বেশি আর কিছু বলার নেই, বললন না। শ্রীনাথবাবু বোড়ে মুরারি দত্তের বাড়ী যাব। পার তো পথ বলে দাও, না পার তো যেতে দাও আমাকে।

ঠিক আছে। বোয়ার নিস্ত যখন, ঠ্যালা সামলাবে। এই দুখে, নিয়ে চ' তো পার্টিকে।

কোথায় ওস্তাদ?

তোর শ্বশুরবাড়ী রে শালা। বল্টে, ঘরে যা। আসছি আমরা। দে, ব্যাগটা দে। ঢুকিয়ে দিয়ে আসি আপদ-বালাই।

চলো।

আমাকে মাঝে রেখে পথ ধরল ওরা দু'জন। দু' পাশেই বাড়ী ঘরদোর। কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছে। কেউ বা উঁকি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কেউ দেখেও দেখছে না আমাদের তিনজনকে। কিন্তু একটা তফাৎ রেখে যাচ্ছে সবাই আমাদের থেকে।

স্পষ্টই বুঝতে পারছি, এখানকার লোকেরা মোটামুটি স্বাভাবিক-

ভাবেই চলাফেরা করছে। তবুও কোথায় যেন বাধোবাধো ঠেকছে। বিশেষ কোন কিছু থেকে জোর করেই সরিয়ে রাখছে ওরা নিজেদের। যারা নিয়ে যাচ্ছে আমাকে, তাদের ব্যাপারেই তারা অতি সচেতন—নির্লিপ্ততায় সচেতন। এই লোকগুলো যাকে নিয়ে যাই করুক না কেন ওদের যেন তাতে কোনই মাথাব্যথা থাকবে না।

হাঁটতে হাঁটতে এক পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায় এলাম আমরা। এধারে বসতি একেবারে থমথমে। বাইরে দেখা যায় না বিশেষ কাউকে। দরজা-জানলা আটকানো বাড়ীঘর, ছেড়ে যাওয়া এলো-মেলো গৃহস্থালীও চোখে পড়ল। কোন কোনটায় অবশ্য লোকজনের সাড়াশব্দ মিলছিল, কিন্তু সব কিছুই কেমন যেন খাপছাড়া।

ওদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চকিতে শেষ তত্ত্বটি বুঝে নিলাম। এ শতকের মানব এমনি করেই নিশ্চিত মরণের দিকে, অনিবার্য ধ্বংসের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তার ভাবনা ঠিক এই সময়কার আমার মতই জট পাকানো—আবেগহীন-উত্তাপহীন। টেনিসনের সেই লেডি অফ্ শ্যালটের মতই ঘটনার স্রোত নিষ্প্রাণ নৌকোর বাহনে তাকে বিসর্জন দিতে যাবে। জানি না, আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখর সম্ভ্রান্তজনের সেই জগৎ কেমিলটে এই নিষ্প্রাণ নৌকো পৌঁছবে কিনা মৃতদেহ নিয়ে। স্যার ল্যান্সলটের নজরে পড়ার মত স্বর্গীয় দ্যুতি তাকে ঘিরে থাকবে কিনা তাও অনিশ্চিত।

প্রশ্ন নেই, কৈফিয়ৎ নেই। মানুষের বাঁচার অধিকার কথাটা পুরোনো হয়ে গেছে। এখন মরার বা মারার ঢালাও অধিকার নিয়েই কাড়াকাড়ি। সেই অপরূপ জল্লাদ-দর্শনের চর্চা ছেয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে।

সেই দর্শনের ঘোর লেগেছে আমায়। কেমন করে সাবাড় করবে আমায় আন্দাজ করতে লাগলাম। সাবাড় হয়ে যেতে কেমন লাগবে। তলোয়ারের কোপ (এখন অবশ্য আমার সঙ্গী দু'জনের কাছে দৃশ্যত কোন অস্ত্র নেই), কিংবা ভোজালির পোঁচ বা ঠাণ্ডা

ইস্পাত ওরফে তীক্ষ্ণ ছুরি কিংবা পাইপগান বা রিভলবারের থ্রি-নট্-থ্রি কোনটা আমার ঘাড়, গলার নলি, বুক অথবা হৃদয় স্পর্শ করবে আর তখন কেমন লাগবে? এদেশে এককালে শূলে চড়াত, কিংবা ঘাতকের খাঁড়ায় কাজ সারত। ফ্রান্সে 'রেন অফ্ টেরারে' গিলোটিন নামক উপায়ের জন্ম। একমেবাদ্বিতীয় হিসেবে গিলোটিন বহুকাল জাঁকিয়ে ছিল। সুসভ্য আমেরিকা পয়দা করেছে ইলেকট্রিক চেয়ার, গ্যাস চেম্বার। ফায়ারিং স্কোয়াডের রমরমা ছিল সমাজতন্ত্রী রাশিয়ায়। জনগণতন্ত্রী চীনে রাইফেলের নলই একেশ্বর।

কিন্তু এরা এ ব্যাপারটা কী করছে কয়েক যুগ পেছিয়ে গিয়ে? ভোজালি, তরোয়ার, ছুরি, চপার—এগুলো এ যুগের নয়। পাইপগান-রিভলবার নামে আধুনিক হলেও সাবেকী গন্ধ আছে।

ইচ্ছে হল, বলি এদের,—নতুন কোন মেথড বের করে ফেল তোমরা। নরমেধযজ্ঞের ইতিহাসে তোমাদের নাম রক্তাক্ষরে আরও জ্বল্‌জ্বল্ করবে তাহলে।

পুরোনো চকমিলানো একটা বাড়ীর সামনে এসে দেউড়ির মধ্যে ঢুকল ওরা আমাকে নিয়ে। চামচিকে-বাদুড়ের ভ্যাপসানি গন্ধ আর শ্যাওলা-শ্যাওলা একটা চেতনা যেন প্রাগৈতিহাসিকবোধে আচ্ছন্ন করল।

কিন্তু নাঃ! একটা জলসাঘর-মত প্রকাণ্ড হল ঘরে নিয়ে গেল আমাকে। কয়েকজন সেখানে বসে আছে শপের ওপর। এক কোণে অজস্র অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। বারুদের গন্ধ পেলাম। আর এক কোণে ল্যাবরেটারী বসে গেছে। মনে হল, বোমা বাঁধা হচ্ছে।

সবাই জিজ্ঞাসার চোখে চাইল আমাদের দিকে।

ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল। রিপোর্টার। বলছে, কোথায় কে মুরারি না কি নাম তার বাড়ীতে যাবে। যে নিয়ে এসেছিল সেই মাতব্বরটা বলল।

যারা বসেছিল, তাদের মধ্যে একজন সোজা হয়ে বসল। হাত

দিয়ে শপের ওপর বসার জায়গা দেখিয়ে দিল আমায়। তারপরে ফিরে বসল আমার দিকে।

কোন কাগজের লোক ?

কোন্ কাগজের নয়।

মিথ্যে বলছে। এটা কী? কার্ডটা বের করে দেখাল মুখে।

দেখি, কার্ডটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল এখানকার সেই কর্তাব্যক্তিটি। ও, ফ্রী ল্যান্স ? রিপোর্ট-টিপোর্ট দিচ্ছেন না কি মশাই ?

না, আমি এসেছি অন্য কাজে।

ব্যঙ্গের হাসি হাসল কর্তাব্যক্তিটি।

এমন জায়গায় এমন অবস্থায় কোন রিপোর্টার অন্য কাজে আসে বিশ্বাস করতে বলেন ?

বিশ্বাস করা-না-করা আপনাদের অভিরুচি।

আপনি বোধহয় জানেন না। হাসি হাসি মুখে বলল সে, সব রিপোর্টিং এখানে কয়েকদিনের জন্যে প্রহিবিটেড। রিপোর্টারদের কাজ হল হয়কে নয়, নয়কে হয় এই সমস্ত করা। এখানে যে অপারেশান চলছে, তার কোন বাজে ডিটেল্‌স্ কাগজে বেরোক চাই না আমরা। যদি কেউ তা করতে চান, জনস্বার্থেই তাকে চাপতে হবে আমাদের—যে কোন উপায়ে।

কিন্তু এ ব্যাপারে আমার একটুও আগ্রহ নেই।

মাপ করবেন, বিশ্বাস করতে পারছি না।

তাহলে কিছুই বলার নেই আমার। যা খুশি করতে পারেন। যদি খুন করে ফেলতে চান, আমি অসহায়।

স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখল সে। তারপরে ভ্রূ-ভঙ্গি করে বলল: আপনার জন্যে 'ফীল' করি। একটা আশা নিয়ে এসে পড়েছেন। ভাবতে পাবেন নি এমনিভাবে ধরা পড়ে যাবেন। তবে হ্যাঁ, একটা কথা। আপনি অন্য এলাকার লোক, এসে পড়েছেন। কোন কিছু ভাল করে না জেনে দুম-দাম খতম করব না আমরা এখন।

আমাদের কাজ প্রায় শেষ। এখানে বসতে হবে আপনাকে। কোথায় যাচ্ছেন, কী বৃত্তান্ত খবর নেব আমরা। তারপরে যদি বুঝি, আপনার আসল মতলবটা আমাদের কাজের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহলে কিছু করাব উপায় নেই। আর যদি অন্য ব্যাপাব হয়, আপনাকে যথাস্থানে পৌঁছে দেব আমরা। তবে মনে হচ্ছে, নিউজ্-হাণ্ট করতেই এসেছেন।

মনে হল, বাঁচতে পারি। আবাব ধারণা কবলাম, আসল উদ্দেশ্য ধরেও ফেলতে পারে এরা। ব্যাগটাকে ভাল কবে যদি দেখে, ডায়েরীর ছেড়া পাতাগুলো যদি পড়ে, মাইক্রো-ক্যামেরাটা যদি ধবে ফেলে তাহলে—

আব একটা কথা। মনে কবিয়ে দিল লোকটা। আপনাকে শত্রুপক্ষের লোক বলে বুঝতে পাবলেও কিন্তু কিছু কবার থাকবে না আমাদের। কোন চিহ্ন রাখব না আমবা ওদেব। সেক্ষেত্রে আপনাব ভাগ্যে কী আছে আন্দাজ কবে নেবেন।

সেদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত।

বলতে পাবতাম যার নাম বলছি তাকে খবর দিন, নিয়ে চলুন তার কাছে। সহজেই চুকে যাবে ব্যাপাবটা। তা বললাম না। মানুষকে যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো ভাবী ঘৃণ্য মনে হল। কেন না তা যেন হবে প্রাণভিক্ষা। তা কখনো চাইব না আমি।

যারা নিয়ে এসেছিল আমাকে, নির্দেশ পেয়ে চলে গেল। রেখে গেল ব্যাগটা। শুধু টাকাগুলো তাদের পকেটেই থেকে গেল।

আপনি একটু সরে বসুন দেয়ালের দিকে।

বুঝলাম, তফাতে রাখতে চাইছে আমাকে। শরীরটা এলিয়ে পা ছড়িয়ে বসলাম। ওরা কিন্তু আর চাইল না আমার দিকে। নিজেদের কথাবার্তা যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকল। শুধু গলার স্বর নেমে এল আরো।

ওপর দিকে ভাঙা ঝাড়লণ্ঠনগুলো দেখছি। কানে কিছু কিছু কথা

আসছে। শ্যাওলাধরা কড়িবরগার দিকে চাইতে চাইতে নিজের অজানতেই ওদের আলোচনায় কান দিয়ে ফেলছি, শুনছি কিছু কিছু—

গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে? ক'টা?

শুনতে পেলাম না উত্তরটা।

কিছু কিছু পড়ে থাকবে।

থাক্। বটতলা-কলুপাড়ার খবর?

জবাবটা পৌঁছল না কানে।

পালাতে পেরেছে কেউ কেউ?

পুরো খবরটা পাইনি। তবে বিবল শট্‌ডেড্।

আর ওখানকার সেই চাঁইটা—শিবশঙ্কর না কী?

পালিয়েছে।

মেয়েগুলো?

খুব আস্তে জবাব দিল একজন। তবে জবাবটা ঠিক মেলেনি নিশ্চয়। আবার জিজ্ঞাসা—

সেই যে সেই মেয়েটা—জজসায়েব না কার যেন মেয়ে?

কে? বন্না? কোন হদিস মেলে নি এখনো। তবে, যতটা কখবে ওরা ভেবেছিলাম, তা পারলই না। যখন ঢুকলাম আমরা তিনদিক দিয়ে হেভি চার্জ হল। ব্যস্, সব ঠাণ্ডা। দু-চারটে ফায়ার করেছিল। আমরা যে বেটে স্টেন চালিয়েছি, দাঁড়াতে পারল না।

এখন কী অবস্থা? ক্লীয়ার?

না, বাছাবাছি চলছে। এ্যাকশান করতেও হচ্ছে। ঘিরে ফেলেছি আমরা। এবারে বাড়ী বাড়ী রেড্ চলছে।

দেখো, আবার যেন বাড়াবাড়ি করে না ফেলে। একেবারে সিওর না হয়ে যেন কারো ওপর কিছু করে না বসে। এদিকটায় বড্ড বেশি হয়ে গেছে।

সে স্যার, উপায় নেই। এ্যাকশানের মুখে।

সেটা কণ্ট্রোল করতে হবে। এই যেমন, বুড়ো পরেশবাবুটাকে শুনলাম মিছিমিছি পুড়িয়ে মারলে। এতটা ভাল নয়। সকলের মুখ চাপা দিতে পারা যায়? জানাজানি হলে ব্যাপারটা নিয়ে ক্যাপিট্যালইজ করবে কেউ কেউ। কী দরকার এসব সুযোগ করে দেবার?

মিনমিন করে কিছু বলল একজন। তাতে সন্তুষ্ট মনে হল না কর্তাব্যক্তিটিকে। বলে চলল: তাহলে তোমাদের এখানে আসার কী মানে হয়? পরেশবাবুর ছেলে না হয় পার্টি করে। সে তো ধর দু'বছর বাড়ী আসে না। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই বাপ-মায়ের। তবুও বাপটাকে অমনি করে মারতে গেলে কেন? তারপর সেই যে বাচ্চা মেয়েটার হাতটা কাটল কেন তোমাদের লোকেরা? ভাই পার্টি করে বলে ছোট বোনটা কী দোষ করল?

একটু দম নিল কর্তাব্যক্তিটি। তারপর বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল: হ্যাঁ। যারা পার্টি করে, খতম করেছে, এ্যাকটিভিস্ট্ - তাদের দয়ামায়া করো না। এই তো কথা। তাদের যত নিষ্ঠুরভাবে পার শেষ কর। তাই করেছ তোমরা। কিছু বলছি তাই নিয়ে, না কোন কথা উঠবে সে ব্যাপারে? উঠলেও অন্য জায়গায় উঠবে। কিছু যাবে আসবে না তাতে।

বুঝতে পারছেন না স্যার, গ্যাংকে গ্যাং একবার লেলিয়ে দিলে আর সামাল দেওয়া যায় না।

কেন যাবে না? অপারেশান চালাবার জন্যে নিজেদের কষ্ট করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয়। কথা না শুনলে লাথি দিয়ে খেদিয়ে দিতে হয়। নইলে আবার পি-ডি'তে ভরে' দেবার কথা বললেই যথেষ্ট।

এখন আর স্যার পি-ডি-এ্যাক্টের ভয় করে না কেউ। প্রুফ হয়ে গেছে ওরা।

বেশ তাই যদি হয় ফেলে দাওনি কেন যারা কথা শোনে না তাদের ?

একজন এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, কোন কথা বলেনি। সে নড়ে চড়ে বসল। তারপরে বলল : ওদের হ্যাণ্ডল্ করাই বিপদের ব্যাপার। কোন কাণ্ডমাণ্ড জ্ঞান নেই তো। এদিক-ওদিক হলে কখন কী করে বসবে তার ঠিক নেই। স্বভাব-অপরাধী তো সব।

এটা একটা বাজে অজুহাত, ঘটকবাবু। কর্তাব্যক্তিটি চটে উঠলেন। এ্যাকশান তো এর আগে আমিও করিয়েছি কোন কোন জায়গায়।

করিয়েছেন, তবে এত বড় এ্যাকশান করাননি।

নাই হোক। এ্যাকশান তো বটে। যাক্, যা হয়ে গেছে তার তো আর কোন চারা নেই। কিন্তু ভবদার কাছে গালিগালাজ খেতেই হবে এইসবের জন্যে। কলুপাড়ার পুরো খবরটা চাই আমার। দেখ দেখি, কদ্দুর কী হয়েছে। আজ সন্ধ্যের আগেই প্যাক-আপ করতে হবে। বট, যাও ঘুরে এসে বল ঝটপট।

এতক্ষণ ধমক খেয়ে যারা কৈফিয়ৎ দিচ্ছিল, তাদের একজন উঠে পড়ল। বেরিয়ে চলে গেল তাড়াতাড়ি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ওরা। কর্তাব্যক্তিটি সিগারেট ধরাল। ঘটকবাবু বলে লোকটা অন্য কথায় এল এবার।

লরিগুলো আসবে তো এদের নিয়ে যেতে ?

নইলে যাবে কী করে ? এক এক দল এক এক এরিয়ার। সে সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু যাবার পথে ওদের দেখবে তো সবাই ?

তা দেখুক না। ওরা এখানকার ড্রেস বদলে নেবে। সাধারণ ড্রেস পরবে। কালিঝুলি পরিষ্কার করে নেবে।

তাহলে এখানকার ড্রেসগুলো সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে

সে সব ভাবতে হবে না। ব্যবস্থা হয়ে আছে।

এদের কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল আপনা-আপনি। জ্বালা-করা চোখে চেয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে অনেক লোকের ভিড়। সবায়েরই চেহারার এক ধরণ। গালভাঙা, চোয়াল উঁচু, চোয়াড়ে চোয়াড়ে ধরণের চেহারা। ব্যাগটা পায়ের কাছেই পড়ে আছে। আগেই নিয়ে নিলাম সেটাকে। তাবপরে এই বিচিত্র সমাবেশের চাপা গুঞ্জনের দিকে মন দিলাম।

কথাবার্তার আসল বিষয়, সবে শেষ করে ফেলা একটা কাজ। কলুপাড়া থেকে খতমের দল পুরোপুরি উচ্ছেদ। এত অল্প সময়েব মধ্যে অমন জোর একটা ঘাঁটি দখল করতে পেরে বীতিমত উল্লাস সকলের। ভাবতেই পারে নি ওরা এমনটা। এদের কিছু কিছু লোক ঢুকে পড়েছিল আগে থেকে ঐ দলে, আশ্রয় নিয়েছিল ঐ পাড়ায়। আসল সময়ে সরে গেছে তারা, আক্রমণ প্রতিরোধ তো করেই নি, উল্টে আক্রমণকারীদের পথ দেখিয়ে দিয়েছে. ঘাঁটি চিনিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়াও ঐ দলে আব যারা ঢুকেছিল, তাদের বেশির-ভাগ শেষ অবধি ভয়ে হাত মিলিয়েছে এদের সঙ্গে। যাদের সঙ্গে বসে কৃষিবিপ্লবের দীক্ষা নিয়েছে, তাদের অনেককে সামনাসামনি খুন করে দেখিয়েছে, আসলে কোন দলে তারা।

মনে পড়ে গেল, স্যাবোটেজের কথা। সেই তরুণ নেতাকে দেখেছিলাম বিচলিত হতে।

ভাবলাম, তাহলে এই অভিনব অভিযাত্রী দলের এই জায়গা থেকে বিদায় নেবার সময় এসে গিয়েছে। কিন্তু আমাব যাওয়ার কথা বলি কাকে? কারোই নজর নেই আমার দিকে। সেই কর্তা-ব্যক্তিটিকে দেখতে পাচ্ছি না আর। তার সঙ্গীদেরও নয়। যারা ধরে এনেছিল আমাকে তাদেরও কোন হদিস নেই এখানে।

এই চলে যাওয়ার সময়। ওদের এই আনন্দ উল্লাসের অবসরে বেরিয়ে পড়ি। যদি কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে কী বলব ভেবে পেলাম না।

নিশ্চয় এরা কেউ ঘুরছে না এখন রাস্তায় রাস্তায়। এখনি আমার সুযোগ সমস্ত এলাকাটা, মায় বটতলা ঘুরে অভাষ্ট সিদ্ধ করা। স্বাভাবিক অবস্থা আসার আগে পর্যন্ত এই সুযোগটা থাকবে। অতএব এখান থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে আমাকে।

হঠাৎ টলতে টলতে একটা ছেলে ঢুকল ঘরে। কেউই দেখল না তাকে। এসেই সামনে যাকে পেল, তাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে আরম্ভ করল।

এ্যাই! কে রে এটা? কোত্থেকে জুটল এসে? ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিল সে।

ছেলেটা উন্মাদের মত হাসছে তখনো।

কি রে এত ফূর্তি কেন? হয়েছে কী?

আর কী হবে? হাসতে হাসতে বলল ছেলেটা, শালা দশটা খুন করেছি নিজের হাতে। একটা খুনের বদলা দশটা খুন। আমার বাপকে খতম করেছিল ওরা শ্রেণী শত্তুর বলে, তার জবাব দিয়েছি।

তা বেশ করেছিস্। পালা এখন এখান থেকে।

কেন পালাব? আমি তো তোমাদের পার্টিতে লাইফ মেম্বার হয়ে গেছি। পালাব বললেই পালাব? মাইরি আর কি! মাল-ঝাল দাও বাবা, টানি একটু ফিনকি দেওয়া রক্তে চান করেছি, গা ঘুলোচ্ছে।

এ ছোড়াটা কে রে?

ঘরে যারা ছিল মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

এখন চিনবে না তোমরা। ইলেকশানে ভব ঘোষালের হয়ে খেটেছি। দেড়শো'টা ফল্স্ ভোট দিয়েছি। পেটো ঝেড়ে ভোটার বেরুতে দিইনি। বাইরের পার্টি তোমরা, জানবে কোত্থেকে? হঠাৎ হাউ হাউ করে কাঁদতে সুরু করল ছেলেটা, জানত ডালুদা। সেও ভব ঘোষালের হয়ে জান লড়িয়ে দিয়েছিল ইলেকশানে। তাকে খুন করল ওরা। না, ওদের মধ্যেই ভব ঘোষালের লোক ঢুকেছিল।

তারাই উস্কুনি দিয়ে খুন করিয়েছে ডালুদাকে। নইলে বুবি', যার গ্রুপ খুন করল, তারা বুক ফুলিয়ে বেড়ায় কী করে বড় রাস্তায়, সিনেমার সামনে ?

এ্যাই, চুপ কর। নইলে গলা কেটে দোব। একজন শাসাল।

তা দাওনা মাইরি, এখুনি দাও। যে শাসিয়েছিল তার হাতছুটো জড়িয়ে ধরল দু-হাত দিয়ে। আবার কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাপটা খতম হয়েছে। চাকবি খুঁজতে হবে না তাহলে। দেখতে হবে না মা আর বোন দুটো কেমন কবে না খেতে পেয়ে মবে। আর দশটা খুন, নিজেব হাতে কবেছি তার ভাবনা থেকে বেহাই পাব। গলাটা উচু কবে হাত দিয়ে ঘরেব কোণে রাখা হাতিয়াবগুলো দেখিয়ে বলল আবার ছেলেটা, কুচ্ কবে কেটে দাও নলিটা। লক্ষ্মী দাদা আমাব।

নাটকের ক্লাইম্যাক্সটা কোথায় সরে পড়বে জানি না। সকলেই দর্শক হয়ে গেছে এই অদ্ভুত দৃশ্যের। কেউ উপভোগ কবছে াক না জানি না। মজা দেখছে হয়তো কেউ। স্বস্তিবোধ না করাব মত লোকও দু' একটা থাকা সম্ভব। আমাব কাছে উপভোগ বা অস্বস্তি কোনটারই প্রশ্ন নেই। শুধু ভাবছি, বেবিয়ে পড়াব এই হল সময়।

আব মুহূর্তকাল দেরী না করে হলঘব ছেড়ে দেউড়ি পাব হয়ে রাস্তায় পড়লাম। ব্যাগটা তুলেই নিয়েছিলাম। সবায়েব মনোযোগ ছেলেটাব দিকে, দেখেও দেখল না কেউ আমায়।

রাস্তা দিয়ে চলেছি ববাবব।

কয়েক ঘণ্টা আগে এই পথ দিয়ে এসেছিলাম নিশ্চিত মবণেব সম্ভাবনা নিয়ে। সুযোগটা পিছলে গেল কেমন অবিশ্বাস্য ভাবে। আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবাব ফুরসৎ নেই ওদের। তার থেকেও অনেক জরুবী তাগিদ আছে।

কী করতে এলাম ? কোন কাজ নিয়ে প্রায় একটা দিন হতে যায়, ঘুরছি পথে পথে ? যা আমার লক্ষ্য তাতে কোন অন্যায় নেই

বলেই জানি। একদা দূতেরা ছিল অবধ্য, সম্মানিত। খবর জোগাড় করার মধ্যে সে যুগের দূতের চেয়েও সম্মান আছে, জানি। কিন্তু একী করতে হচ্ছে আমাকে? মিথ্যাচরণ করে সংবাদ-শিকারী আমি সেই সম্মানকে কোথায় নামিয়ে দিয়েছি! আরও কত মিথ্যাকে মূলধন করতে হবে। হোক, এর জন্যে বিবেকের তাড়না বোধ করব না। কারণ আলোর পৃথিবীর কোন অংশ আচম্বিতে অন্ধকারের মোড়কে ঢাকা পড়লে, সেই অন্ধকারে সত্যের স্থান থাকে না। আলো যখনই বিদায় নিল, তখনি ভূমিষ্ঠ হয়েছে মিথ্যা। তাই অপরাধবোধ আচ্ছন্ন করছে না আমাকে এতটুকুও।

সাম ওয়েনকে বিক্রী করার মত পশরা সাজাতে হবে। বিশ্বসভায় বিকোবার জন্যে যে চটক দরকার তা কতদূর আনতে পারব ভাবছিলাম। কিন্তু সবই যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সুরুটা ধরতে পারছি। মাঝখানটা দিয়ে চলেছি। শেষটুকু ধরতে হবে। কোথায় পাব সেই শেষটুকু? কখন? মাঝদরিয়া পার হতে আর কত বাকী কে জানে!

দাদা যে! কী ব্যাপার? আছেন তাহলে?

তাল-কানার মত চলেছিলাম রাস্তা ধরে। হঠাৎ দেখলাম, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চিনে। সেই যে আগের রাতে অন্ধকারের মধ্যে আমাকে বটতলার মুখে ছেড়ে দিয়ে উধাও হয়েছিল।

পেলেন যাকে খুঁজছিলেন? আবার জিজ্ঞাসা করল চিনে।

না। ঘাড় নেড়ে জানালাম।

তাহলে ফুটে গেছে। নির্ঘাৎ ফুটে গেছে। ঠোট উল্টে বলল চিনে। বটতলায় হদিস করতে পারলেন না? ওরা কোন তালাস দিল না?

না!

কোথায় যাবেন এখন? ফন্টাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না, দেখা করব।

তাহলে এদিকে চললেন কোথায়?

এদিকে নয় ?

না। পথ চেনেন না বুঝি ? চলুন।

ফেলে-আসা পথ দিয়ে আবার চললাম ওর সঙ্গে। সেই পুরোনো, সেকেলে ধরনের বাদুড়-চামচিকের ভ্যাপসানি গন্ধ আর শ্যাওলা ছাওয়া বাড়ীটা। তার সামনে দিয়েই নিয়ে চলল আমাকে চিনে। একটা চীৎকার আসছে ভেতর থেকে, কিছু কোলাহল, গুঞ্জন।

এককালে বোধহয় পুজো-আর্চা হত বাড়ীটাতে, মুজরো-মাইফেল বসত অর্থাৎ বলি হত, বাইজী নাচত, গান গাইত। তারই ফাঁকে ভেসে আসত বলির পশুর পরিত্রাহি চীৎকার কিংবা কোন মাতোয়ালা কণ্ঠের উল্লাস।

সে রকম কিছু চলছে ? সেই যে ছেলেটা চেঁচাচ্ছে। ও বলির পশু না বেহেড মাতাল বুঝলাম না। তবে অভিনব পুজো বা মাইফেলের চাপা কোলাহল বা গুঞ্জনটা বুঝতে কোন অসুবিধে নেই।

একটু দাঁড়ান দাদা। দেখে যাই, কোন কিচাইন বাঁধিয়েছে আবার।

না। চলো।

দৃঢ়ভাবেই কখন ওর হাত চেপে ধরেছি। অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল চিনে। তারপর একটু হেসে বলল, ভয় পাচ্ছেন ? ভয় পাবেন না, আমি সঙ্গে আছি জানবেন। একটু, এই একটু দাঁড়ান।

আর এগিয়ে দেউড়িতে ঢুকতে হল না চিনেকে। সেই ছেলেটাকে টানতে টানতে নিয়ে বেরোল জনাচারেক। ছেলেটা মরে গেছে না অজ্ঞান হয়ে আছে বোঝা গেল না। চিনেকে দেখে ওরা কোন কথাই বলল না। বেরিয়ে চলে গেল উল্টোদিকে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইল চিনে। দাঁতে দাঁত চেপে একটা অশ্রাব্য খিস্তি করল লোকটাকে। দেখলাম, হাত-দুটো মুঠো হয়ে গেল ওর। কোমরের দিকে উঠতে গেল একটা হাত, কিন্তু পড়ে গেল পরক্ষণে। অসহায় ভঙ্গিতে দু-পাশে দেখল

তারপরে আমাকে বলল ঃ হ্যাঁ, চলুন। আমাকে লুকিয়ে ও একটা জোর নিশ্বাস ফেলতে চাইল।

• যেতে যেতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম ওকে ঃ কোথায় নিয়ে গেল ছেলেটাকে ?

কে জানে ? হাত উল্টে বিচিত্র ভঙ্গি করল চিনে। চেপে গেল। ও জানে, ছেলেটাকে হয়তো—হয়তো যা আন্দাজ করেছি আমি, তা নিশ্চিত জানে ও।

চেনা ছেলে ? তোমাদের পাড়ার ?

ঐ একরকম চেনা। ঠিক পাড়ার না।

তবে বললে না যে কিছু ?

না! আনমনাভাবে জবাব দিল ও। একটু থেমে আবার বলল, আর বললেই বা শুনছে কে ? ও ব্যাটার পালক গজিয়েছে। বললাম, ছোড়া শুনল না কথা। ডেঁপোমি করতে গেল আমি একা কীইবা করব ঃ

কী হয়েছিল ব্যাপারটা ?

সে শুনে লাভ নেই দাদা।

ছেলেটাকে খুন করতে নিয়ে গেল, না মেরে ফেলে দিয়ে গেল ?

আমাকে ভাল করে দেখল চিনে আর একবার। তারপর বলল ঃ

অত জানলেন কী করে ?

জানব না ? সামনে দিয়ে নিয়ে গেল, দেখে বোঝা যায় না ?

যায়। তবে অতটা বোঝা যায় না। নিশ্চয়ই জানেন আপনি।

খানিক আগেও বসেছিলাম ঐ বাড়ীটার মধ্যে। তখনই এল ছেলেটা, পাগলের মত—বললাম, যেটুকু দেখেছিলাম, সেটুকু।

সেজন্যে ওখানে দাঁড়াতে দিচ্ছিলেন না আমায় ? হাসল ও। অত ভয় নিয়ে কী করে যে ঘুরে এলেন এত সব জায়গা!

ছেলেটা কে ?

হরিদাসের গলিতে বাড়ী। ঐ পাড়ায়।

কী হয়েছে ওর ?

বিগড়ে গেছে ছোঁড়া। বাপটা খতম হবার পর থেকে একেবারে গেছে।

খতম হল কী করে ?

ওর এক দূরসম্পর্কের কাকা পুলিশে চাকরি করে। ইদানীং প্রায়ই সে আসত ওদের বাড়ী। এমনি আসত না অন্য কোন মতলবে আসত জানি না। তাকে একদিন মারতে গেল ওরা।

কারা ?

জানেন না ? যাদের দলের একটা ছোঁড়াকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পুলিশ খতম করছে যারা।

তারপরে ?

ওর বাবা, ভাইকে বাঁচিয়ে দিল।

কেমন করে ?

কোথায় খবর দিয়ে রেখেছিল, বোধহয় পুলিশেই। সন্দেহ করেছিল। যারা মারতে এসেছিল গুলি খেয়ে তাদের দুজন মরল। বেচে গেল সে লোকটা। কিন্তু তারপরের দিনই ওর বাবাকে বাজারে যাবার পথে মেরে ফেলল, বদলা নিল আর কি !

কী কাজ করতেন ভদ্রলোক ?

কোন মাড়োয়ারী কোম্পানীতে চাকরি করত।

তা ছেলেটা এমন হয়ে গেল তাইতে ?

হ্যাঁ। ওদেব অবস্থা ভাল নয়। হয়তো ভাবনা-চিন্তায় হয়েছে অমনটা।

মাথার গণ্ডগোল হয়েছিল নাকি ?

প্রায় তাই। এখনকার এ্যাকশন সুরু হতেই ও ভিড়ে যায় দলে। আগে এক সময় ও ঘোরা-ঘুরি করত ঐ খতম পার্টির ছেলেদের সঙ্গে। অনেক কিছুই জানত। সুলুক সন্ধান দিয়ে এ্যাকশানে বেশ হাত পাকিয়েছিল। কিন্তু তাইতে আরও মাথা গরম করে ফেলেছে।

তাহলে এরা ওকে মারছে কেন ?

বেফাঁস কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে সব, ক্ষ্যাপামি করছে—বোধহয় সেজন্যে।

বোধহয় নয়, এটাই ঠিক। কিছুই অস্পষ্ট নয়। মধ্যযুগের রাজা-বাদশাদের কথা মনে পড়ল। গুপ্তঘাতককে বাঁচিয়ে রাখা হত না। সেই একই কারণ— যদি ফেফাস হয়ে যায়। এখন আর দরকার হয় না গুপ্তহত্যার। কিন্তু বেচাল ঘাতককে ছেড়ে রাখা হয় না।

কথা বাড়ালাম না আর। মুরারির বাড়ার দরজায় পৌঁছে গেলাম একসময়ে। দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ মিলল না। খানিক বাদে ওর সেই বাচ্চা চাকরটা ওপরের বারান্দা থেকে দেখে নিল আমাদের, তারপরে দরজা খুলল।

জানতে চাওয়ার আগেই জানাল, বাবু এখনো ঘুমোচ্ছে।

দরজা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বলেই তিন তলায় উঠলাম। দরজা এঁটে দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে মুরারি। ধাক্কা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করার পরে ধড়মড় করে উঠে এল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আগে জিজ্ঞাসা করল আমায়: খবর পেলি !

না, কোন পাত্তা নেই।

বোস গিয়ে। আসছি আমি।

দু'জনে গিয়ে দোতলার বসার ঘরটায় এলিয়ে পড়লাম। সারা শরীরে যেন কীসের ক্লেদ জমেছে ! সমস্ত ক্ষমতা, শক্তি চাপা পড়ে গেছে তাতে। কথা বলতে অবধি ইচ্ছে করছে না।

বসে পড়েই ঘুম লাগিয়ে দিল চিনে। হাঁ হয়ে গেছে মুখটা। উঁচু চোয়াল-দুটো চকচক করছে। কপালের গভীর কাটা দাগে ময়লা জমেছে। ঝুলেপড়া হাতদুটোর আঙুলের গাঁটগুলোয় চেহারা আরও ভয়াবহ হয়েছে। কদর্য ক্লেদাক্ত চেহারাটা নীরবে দেখছিলাম। ওর বুকের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল একটা ফুলকাটা সৌখিন রুমাল, তার একটা কোণে মেয়েলি ছাঁদে 'আর' ইংরিজি অক্ষর এম্ব্রয়ডারী করা।

জানি না, ওর আসল নাম কী। তবে ওর মনের কোন সঙ্গোপনে একটা জায়গা আবিষ্কার করে ফেললাম যেখানে হয়ত সাধ আছে, একটু যে সাধ মানুষ বলেই থাকে অনেকের।

বাইরে শুনলাম অনেকগুলো গাড়ীর আওয়াজ। বারান্দায় বেরিয়ে দেখতে পারি, কিন্তু ইচ্ছে করল না। বেলটা বেজে উঠল এমন সময়ে। দরজা খোলার জন্যে উঠে নীচে নামতে কোন আগ্রহ বোধ করলাম না। বেশ অস্থিরভাবেই বেল বাজল কয়েকবার।

একটু পরেই নীচে দরজা আর গেট খোলার শব্দ। তারপরে মিষ্টি গলায় চাপা বকুনির শব্দ। টুক্‌টুক্‌ করে জুতোর শব্দ সিঁড়ি ধরে থেমে গেল দোতলার দরজাটার কাছে। তারপরেই সশরীরে দেখা দিল এ বাড়ীর গৃহিণী—তপতী।

আপনি এখানে? আমাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেছে ও।

শুধু ম্লান হাসলাম।

ওরে বাবা! এও আবার? কাল তাহলে খুব জমেছিল বলুন আপনাদের? একেবারে ত্র্যহস্পর্শ, এ্যাঁ? কপালে খাঁজ ফেলে হাসল তপতী।

কোন জবাব এবারেও দিতে পারলাম না।

কখন এলেন? কাল নিশ্চয়ই?

ঘাড় কাত করে উত্তরটা দিলাম।

ও ওঠেনি এখনো?

উঠেছে।

বসুন। চা খাওয়া হয়নি নিশ্চয় সকাল থেকে? এক্ষুনি আসছি। চটপট উঠে চলে গেল তপতী তিন তলায়।

সরিয়ে দিয়েছিল ওকে মুরারি গণ্ডগোলের জন্যে। একা একাই ফিরে এল কেন আবার? এখনো তো স্বাভাবিক অবস্থা ফেরেনি। এলই বা কেমন করে ও?

কিন্তু আমাকে তো ঘুরতে হবে। মুরারিকে নিয়েই ঘুরে আসব।

এখন কি ওকে আমার সঙ্গে যেতে দেবে তপতী ? হয়তো দেবে না ! আজ এই সকালের মধ্যেই শেষ করতে হবে আমার কাজ।

তারপর, সাম ওয়েন। এই কয়েক ঘণ্টা ভুলে গেছিলাম ওর কথা, সুচিরার কথা। সপ্লেনডিড এই এ্যাস ইনমেণ্ট সরে গিয়েছিল আমার মন থেকে। যেন ডুবে ছিলাম বানের জলে—যার নানা স্তরে নিজেকে নিয়ে এতক্ষণ অবিরত হাবুডুবু খেয়েছি। প্রায় মিশে যাচ্ছিলাম নিজে—কিংবা ভেসে বেরিয়ে পড়ছিলাম কোন অকূল দরিয়ায়। দর্শক হতে এসে দৃশ্য হয়ে যেতাম নিজেই। পাকে-চক্রে কূল পেয়েছি। এবারে পথ পাবার পালা।

এখানকার নাটক কিছুটা ধরা দিয়েছে। শুধু এক জায়গায় জট পাকানো আছে একটু। তা ছাড়াতে গেলে আরও একটু খুঁজতে হবে [illegible]। সেটুকু চেষ্টা—তাতে ষোল আনা জটিলতা যাবে কি না জানি না। তবে আশা, যদি প্রথম পর্বের কোন আভাস পাই। একবার ভেবেছিলাম, শেষটুকুই সমস্যা। কিন্তু তা পরিষ্কার হয়ে গেছে জলের মত। এখন ঠেকেছি প্রথমটায়। কীসে সূত্রপাত? কেন কার প্রয়োজন হল ডালু চৌধুরীকে খতম করার? এটুকুর হদিস পেলেই নাটকের কাহিনীর একটা গতি আসে। সুন্দর করে কাহিনীটা সাজিয়েছে কেউ। শুধু ধাঁধার মত প্রথম সূত্রটিকে নিখোঁজ করে রেখেছে। সেই সূত্রটার জন্যে হাতড়াতে হবে আমায়। তাহলে সমস্ত কভাবটার মানে হবে একটা।

মুরারি ঘরে ঢুকল এসে।

ঘুমোস্‌নি তো সারারাত ! ঘুরে মরেছিস্‌ পথে পথে। বরাতে ভোগান্তি আছে তোর দেখছি। নে, চানটান করে লম্বা ঘুম দে একটা।

তুই আমার সঙ্গে চল হঠাৎ বলে ফেললাম ওকে।

কোথায় ? বাড়ী যাবি নাকি ?

পাড়াগুলো ঘুরে দেখব।

তোর কি মাথা বিগড়েছে ? ঘুরতে পারলে কালই যেতাম না ? আজ দলবল ভেগে যাচ্ছে। আর কোন এ্যাকশান নেই ওদের। যেতে পারবি ঠিক, চল।

জেনে এলি তুই ?

হ্যাঁ। দেখেও এলাম। একে জিজ্ঞাসা কর না।

তা করছি। কিন্তু ব্যাপার বুঝছি না কিছু। তপুও তো একলা এল। অবশ্য ওর কথা আলাদা। বলল, কোন ঝামেলা পড়েনি সামনে।

তবে ভয় পাচ্ছিস্ কেন তুই ?

আরে ধ্যাৎ! ভয় পায় কে রে শালা? বলছি কাল রাতে অত ঘুরলি খোঁজ পেলি না। আর আজ এখন সব ফৌত হবার পরে কী কচুটা দেখবি ? তার লাশটাও তো দেখতে পাবি না। অবশ্য এই এরিয়াতে নাও এসে থাকতে পারে ছেলেটা।

না আসুক। দেখব, একটু দেখব, খুঁজে তবুও শেষবারের মত। তুই চল। চিনেকে না হয় ডেকে নে সঙ্গে।

কিন্তু তপু এসে পড়েছে যে! ও যেতে দিলে হয়। জোর করে চলে এসেছে বাপের বাড়ী থেকে। এসে যা, তা বলছে আমায়। বলছে, এইসব ব্যাপার আগে থেকে জেনেই সরিয়ে দিয়েছি ওদের। ভেবেছে, আমিও নেমে পড়েছি। তাই একটু সুযোগ পেয়েই চলে এসেছে। কালই আসতে চেয়েছিল, পারেনি। ফোনের লাইন নাকি কেটে দিয়েছে। ফোন করেও খবর নিতে পারেনি। ওর ধারণা, যদি কিছু হয়ে যায় আমার! অবস্থাটা বোঝ একবার।

বুঝেছি। বুঝেই বলছি চল।

আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তুই এখন সকালের ঝামেলা মিটিয়ে নে আগে।

দেরী হয়ে যাবে। তুই এখনই চল তো!

হচ্ছে হচ্ছে। জাস্ট কয়েক মিনিট। তপু আসছে এখুনি। বলে

নিবি তুই। তোর কেসটা বললে শুনবে। কিন্তু মিছিমিছি ঘুরতে হবে বলে দিচ্ছি।

কোন কথাই বললাম না আর। নীরবে উঠে চলে গেলাম বাথরুমে। চিনেকে ডাকাডাকি আরম্ভ করল মুরারি।

ঠাণ্ডা জলে সারাটা শরীর ভেজাতে ভেজাতে মুরারির পরিবর্তনের কথা মনে এল। কী বেপরোয়া ছিল ও এককালে। ঝঞ্ঝাট ঝামেলা থোড়াই কেয়ার করত। বিশেষ করে বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে জান লড়িয়ে দিত। প্রকৃতির হোক আর মানুষের হোক, কোন বিপর্যয়েই টলাতে পারত না ওকে। আর আজ ও একজাতের ভয়ে আঁকড়ে আছে। বৌ-এর দোহাই পড়ছে এখন।

ঘরে ফিরে এসে দেখলাম, চিনে নেই। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মুরারি। আমি ঘরে ঢুকতেই ও এল। বলল, চিনেকে পাঠালাম দেখে আসতে। এক চক্কর দিয়েই চলে আসবে ও। ততক্ষণে ব্রেকফাস্ট হয়ে যাবে আমাদের। তোর লাকটা দেখছি সত্যি ভালো।

কীসে ?

ভেবে দেখ না। কাল রাতে যে সব জায়গায় ঘুরেছিস্ মানে ঘুরবি বলে গেলি, সেখান থেকে যে ফিরতে পারবি ভাবতেই পারিনি। অন্‌-গড বলছি। তারপরে দেখ, এই যে ব্রেকফাস্ট আসছে, তপু হঠাৎ ফিরে না এলে জুটত না। তার ওপর আবার ভাব, ওই এরিয়া ঘুরে এলি এমন সময়ে যখন বাইরের কেউ এর ধারেও ঘেষতে পারবে না। কত এ্যাডভানটেজ পেলি চিন্তা কর। তবে ঐ শেষটুকু যদি সামলাতে পারিস! মানে আমায় যদি সঙ্গে নিতে পারিস্।

পারব কি ? রাজী হবে তপু ?

জানি না। তবে এখনো খুব খাপ্পা আমার ওপর। যা-তা বলেছে এসে। বলে দেখ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তপতী ব্রেকফাস্ট নিয়ে এল।

ঘরে যা ছিল, তাই দিলাম। দোকান-বাজার তো সব বন্ধ। ঐতেই চালিয়ে নিন।

বোসো একটু, কথা আছে। বললাম তপতীকে।

খেতে খেতে বললাম কথাটা। বলেই বিপদে পড়লাম। জেরা সুরু করল ও। যাকে খুঁজতে এসেছি তার কত বয়েস, কেমন দেখতে, রোগা না মোটা, ফর্সা না কালো এইসব এলোপাথাড়ি জিজ্ঞাসা করে চলল এক নাগাড়ে। তারা কয় ভাই, কয় বোন!

মোটামুটি জবাব দিলাম। সব শুনেটুনে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ও: আহা, কেন যে ঐ সব বিপদ-আপদের মধ্যে যায়! বাপ-মায়ের কত কষ্ট বলুন তো?

ওর কষ্ট দেখে নিজেরও ভারী বিশ্রী লাগল। একটা ডাহা মিথ্যেকে এমনিভাবে—

কিছুক্ষণ আগে মুরারিকে স্বার্থপর ঠাউরেছিলাম। এবারে নিজেকে শুধু স্বার্থপর নয়, ভারী নীচ আর নিষ্ঠুর বলে মনে হল। ও ততক্ষণে বলে চলেছে—জানেন, ঠিক ঐরকম ব্যাপার আমার বাপের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে বাচ্চা ছেলে, নাইনে পড়ে। দু' তিন মাস কোন খবর নেই। শেষকালে কোথায় যেন তার লাশ খুঁজে পেয়ে সন্ধান করে বাড়ীতে খবর পৌছল। কত যে এমন হচ্ছে! কী যেন হয়ে গেল দেশটা।

এক্ষুনি খুঁজতে বেরোব একটু।

কত খুঁজবেন? এই তো বললেন, কাল সারারাত খুঁজেছেন! দেখুন গিয়ে, কোথায় পড়ে আছে খুন হয়ে। হয়ত তল্লাস করতে পারবেন না।

মুরারি একটু যাবে আমার সঙ্গে?

কোথায়?

পাশের দুটো পাড়ায় ঘুরব একটু। আমার ঠিক চেনাশোনা নেই তো, তাই। ও সঙ্গে থাকলে—। কিছুক্ষণ ভাবল তপতী। মুরারি আড়চোখে চাইছে ওর দিকে। বোধহয় মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা

করছে। চোখ টিপল আমাকে। তার মানে আরও বলতে বলল। তোতা পাখীর মতই আওড়াতে সুরু করলাম।

ও থাকলে হয়ত কোন খোঁজ খবর মিললেও মিলতে পাবে। লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে।

কাল রাত্তির বেলায় তাহলে একলাই বেরিয়েছিলেন আপনি? অন্যমনস্কভাবেই জানতে চাইল তপতী। অথচ দেখুন, আমি ভেবেছি, জোর আড্ডা বসেছিল আপনাদেব। ও তাহলে বেরোয় নি বাইবে?

না, ও বেবোয়নি।

যখন বলছেন, সত্যি ওসবের মধ্যে ও যায়নি। লোকটাকে তো চেনেন। চুপচাপ বসে থাকবে বাড়ীতে আর পাড়ায় হিড়িক চলবে এ সহ্য কবতে পারবে না ও।

খব পাববে। তোমার পাল্লায় পড়েই সহ্য হয়ে এসেছে। এখন পারমিশান দাও তো ওকে।

পারমিশানেব কী আছে? আমাব পারমিশান নিয়ে সব কিছু করে? ওব যত সব চালাকি।

তা হোক। তোমাব আপত্তি নেই, এটুকু বলে দাও।

ওঃ! যেন কত সুবোধ বালক! গুলপট্টি দিয়ে আমাদেব বিদেয় করে যা খুশি করছে। যাক না, কে আটকাচ্ছে!

থমথমে মুখে অন্যদিকে চেয়ে রইল তপতী। ওদের মান-অভিমানেব ফাঁকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ছে আমার অস্থিরতা। অথচ একাই বা বেবোই কেমন করে?

তা হলে আমরা বেবোচ্ছি। ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করে ঠেসে ঘুম দোব। স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে ওকে তাড়া দিলাম। ওঠ। এই তো ওকে রাজী করিয়েছি। নে, বেরিয়ে পড়ি চটপট।

চোখের ইশারায় বোঝাল মুরারি, তপতীর রাগ রয়েছে। অগ্রাহ্য করেই ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চললাম। বাস্তায় নেমে বলল: কাজটা ভাল করলি না।

খুব গম্ভীর হয়ে গেল ও। বিশেষ কথাবার্তা বলল না। রীতিমত নিজের মধ্যে ডুবে যাওয়া ওর স্বভাবের বাইরে বলে এতদিন জেনে এসেছি। তার ব্যতিক্রমে আশ্চর্যও হলাম।

কিন্তু শ্মশান পরিক্রমায় কী দেখব? শুধু চিতাভস্ম, মৃতদেহ, আধপোড়া কাঠ আর নিরুপায় শ্মশানবন্ধুদেরই চোখে পড়বে। যেমন এখানে অর্থাৎ হুঁহুটো পাড়ায় যা নজরে এল, তা জনবসতির শ্মশান ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানে যেখানে জীবনের ক্ষীণ অস্তিত্ব দেখা দিল সবই প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, নারী, শিশু।

মুরারি যেন আরো কেমন হয়ে গেল এইসব দেখে শুনে। আমাকে এক এক জায়গায় ছেড়ে রেখে নিজেই এপাশ-ওপাশ ঘুরে দেখে এল। ও কী ভাবছিল কে জানে?

যতটা সম্ভব গভীরে ঢোকার চেষ্টা করলাম। বিবরণ নিলাম, কল্পিত নিখোঁজ ছেলেটি সন্ধানের ছলে। তারি মাঝে মাঝে মাইক্রো-ক্যামেরাটাও কাজ করল। তছনছ হয়ে যাওয়া নীড়, বিধ্বস্ত গৃহস্থালী, জ্যান্তে-মরা আতঙ্কে নিরুত্তর কিংবা নিস্তব্ধতায় নির্বোধ প্রাণীদের ছবি যেখানে যেমন সম্ভব নিলাম।

সেদিন বিকেলের দিকেই আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিল মুরারি। কার্ফু জারী হয়েছিল সন্ধ্যে থেকে। তার আগেই চলে এসেছি।

ফিরে শুনলাম, চব্বিশ ঘণ্টা অনুপস্থিতির মধ্যে টেলিফোনে দু'বার আর সশরীরে একবার খবর নিয়েছে সুচিরা। বাড়ীর লোক উদ্বিগ্ন। নিরুদ্দেশ বার্তা ঘোষণা করা নিয়ে দ্বিধাসংশয় দেখা দিয়েছে। বলে দিলাম কেউ খুঁজতে এলে বা ফোন করলে যেন বলা হয়, ফিরিনি। সকালের আগে কেউ যেন বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটায়।

মুরারির সঙ্গে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি লিখে ফেলতে হবে। অভিজ্ঞতার যে নিদারুণ পর্বটুকু এক অবিস্মরণীয় উপলব্ধির

স্বাক্ষর হয়ে রইল তার দলিল রচনা করতে হবে। কোন কালে, কোন ইতিহাস লিখবে কি না নিশ্চিত জানি না।

একদা কোনখানে মানবসমাজের সভ্যেরা নিতান্ত অবর্ণের সমাজকে কায়েম করতে হাত মিলিয়েছিল পরম এক উৎসবে। শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্য, জরা—কী নর, কী নারী এর কোন অবস্থাতেই সেই উৎসবের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। হোক না তা ধরণীর এক কোণে, সারা দুনিয়ার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিসরে। এক চিলতে নগরী তো সারা পৃথিবীকে মুঠোয় করে রেখেছে যুগে যুগে, কখনও বা লোফালুফি করেছে দু-হাতে, কখনও আবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে শুকনো হাড়ের মত। সেই এক চিলতের গৌরবে কিংবা অপঘাতে সারা দুনিয়া হয় ঝলমলিয়ে উঠেছে নইলে অপমৃত হয়েছে।

তাই মুরারিদের এলাকাটাকে যদি সারা দুনিয়ার নজরে দেখি, বোধহয় বাড়াবাড়ি হবে না।

কার কোন কাহিনীই বা বিশেষে লিখব ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

সেই যে ছাপোষা কেরানীর পরিবারটি, দিনগত পাপক্ষয়ের সীমানায় ধুঁকতে ধুঁকতে করে ছেলে-পুলে বড় হয়ে রোজগার করবে সেই আশা নিয়ে কোনমতে টিঁকেছিল—তার নিঃশেষে মুছে যাওয়ার কথা লিখব? ফ্যাকাশে রোগা হাড় জিরজিরে শুধু বড় বড় দুটো সম্বল চোখের অধিকারিণী সেই কেরানী পরিবারের বৌটি যে চোখের সামনে স্বামী, দেওর, দু'দুটো ছেলের রক্ত একে একে ফিনকি দিয়ে উঠে তাকে নাইয়ে দিতে দেখেছে, তার বিহ্বল কথা ক'টা বোধহয় নেহাৎ মামুলী শোনাবে। তার কোন অভিযোগ নেই কারো বিরুদ্ধে, শুধু একটু ক্ষোভ,—মারল না কেন আমাকে! এই তো সেদিন, পুলিশ খুন করে তিনটে ছেলে লাফ দিয়ে এসে পড়ল বাড়ীর ভেতর। ত্রস্তা গৃহবধূ চেঁচিয়ে উঠবে ভয়ে, একটা কাতান তুলে ছেলেক'টা

বলল, টুঁ শব্দ করলে কেটে ফেলব। চট্‌পট্‌ সরে যাও। তক্ষুনি ঘরে ঢুকে পড়েছে। আর কেউ ছিল না তখন বাড়ীতে। খানিক পরে ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এসে দেখে, রক্ত ধুয়ে গেছে কলতলায়। তার দুঃখ প্রথমে যদি চেঁচিয়ে উঠত, এসব দেখার জন্যে বেঁচে থাকতে হত না।

ওদের বাড়ীতে জোর করে লুকিয়ে পড়েছিল খতম-পার্টির একটা ছেলে—তারই মাশুল চারটি প্রাণ।

কী যেন নাম শিশুটির? মনে আসছে না। কিছুদিন আগে তার এক দূর সম্পর্কের মামা এসে উঠেছিল তাদের বাড়ীতে। কোন ফ্যাক্টরিতে কাজ করত যেন শিশুটির বাবা। আত্মীয়কে অতিথিরূপে রাখার মাশুল দিল স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই জীবন দিয়ে। শিশুটি অনুভূতিহীন চোখে দেখেছে এই হত্যাকাণ্ড। শিশুটিকে আগলে রেখেছে কোন প্রতিবেশী। কিছুক্ষণ কেঁদে কেঁদে বোবা হয়ে গেছে সে বোধহয়, শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে ছিল আমাদের দিকে।

হ্যাঁ। আর সেই ছেলেটা এসেছিল প্রেমের টানে। কোথায় যেন বাড়ী? ডগ্‌ডগে তাজা জোয়ান ছেলে। সেটাই বোধহয় তার কাল। জানি, যৌবনই তো কাল। কত কীসের কাল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু একাল হল তার শেষ। কেন যে এখানে এল ওরা জানি না। তবে পালিয়েই এসেছিল বোধহয় ওরা দুটিতে। হায়, আর কোন জায়গায় পালিয়ে গেল না কেন? কোন পরিচয়ের সূত্রে কেন একটা গোটা পরিবারের লাগোয়া একখানা ঘরে এসে উঠল এই গনগনে বসতির মাঝে? সেই পরিবারের কোন কোন ছেলে বোধহয় বিশেষ কোন দলে ভিড়েছিল। এইটুকু অনুমান। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া পরিবারটির সঙ্গে তাজা জোয়ান ছেলেটাও গুলি খেয়ে মরেছে। মুরারির সঙ্গে সেই বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে আঁতকে উঠেছি। ছোট্টখাট্ট উঠোনে তাজা জোয়ানের লাশ আঁকড়ে ধরে রক্তমাখামাখি অবস্থায় তখনো পড়ে আছে মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে।

যৌবনের টাটকা খুন কখন এসে লেগেছে ওর সিঁথিতে, শুকিয়ে অদ্ভুত এক চকোলেট্ রঙ হয়ে গেছে। দয়িতের মৃত্যু কী উপহাস করে গেছে সীমন্তিনীর পরিচয়কে ?

আর সেই মাস্টারমশায়ের খণ্ডছিন্ন মৃতদেহটা এক ঘরভর্তি বইপত্র খাতার মাঝখানে পড়েছিল উবুড় হয়ে। ঘাড়টা কোন ধারাল অস্ত্রের আঘাতে হাঁ হয়ে আছে। অকৃতদার একলা মানুষ এই মাস্টারমশাই নাকি গোপনে দল করতেন। তবে তাঁর ঘরের আলমারীতে সেক্সপীয়র, গ্যেটে, শেলী, কীট্স, বায়রণ, ব্রাউনিঙ, আর্নল্ড, ইয়েট্স্ আর কবিগুরু ছাড়া আর যা চোখে পড়েছিল বোধহয় সেগুলোই হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ। মাও সে তুং, হো চি মিন আর কুও-মো-জো—এদের কাব্য-সংকলনও সেই একই আলমারীতে চোখে পড়েছিল।

এমনি হাজারো কাহিনী, চোখে দেখা, কানে শোনা। সবই লিখছি আলাদা করে। প্রত্যেকটা হত্যাকাণ্ডের যতটা সম্ভব বিবরণ সংগ্রহ করেছি। সেই দলিলটাই আমার পণ্য, যা সাম ওয়েন কিনবে। অনেক মানুষের রক্ত আর প্রাণের বিনিময়ে যার বাণিজ্য টেনে নিয়ে গেছে আমায়।

লেখা শেষ করার আগেই তাগাদা এসেছিল নাকি। আবার ফিরে গেছে সুচিরা। কাজেই ওকে ফোন করলাম প্রথমে।

কী কাণ্ড তোমার! বেঁচে আছ? বিস্ময়ের বদলে ওর গলায় উল্লাস।

আছি।

রিপোর্ট করার মালমশলা মিলেছে তো ?

মিলেছে।

ছবি তুলেছ ?

তুলেছি।

বাঃ, ব্রাভো! একটু থেমে নরম সুরে বলল সুচিরাঃ আচ্ছা। আমার এখানে আসবে একটু?

আসব?

হ্যাঁ, আসবে। খুব ব্যস্ত?

, একটু। আচ্ছা, একটুখানি ভেবে বললাম, যাব ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। টেলিফোন ছেড়ে দিল সুচিরা।

আনমনাভাবেই বেরিয়ে পড়লাম। ট্যাক্সি ধরতে হবে। মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। কেমন করে কোথা দিয়ে যে প্রায় পুরো একটা দিন কেটে গেল তা ভাবতে অবাক লাগছিল। ঘটনার রকমফেরে কত না বিচিত্র মানুষজন আর তাদের ব্যবহার একটি সূত্রে গেঁথে ফেলেছে অভিজ্ঞতাটুকুকে। জীবন মৃত্যুর মাঝে দোল খেয়েছি, স্নেহভালবাসা সম্মানও পেয়েছি আবার ধর্ষিতা রমণীর মত অবমাননায় ভূলুণ্ঠিত হয়েছি। এর প্রত্যেকটারই কারণ আছে, পটভূমি আছে

কোথা থেকে একটা ঝরঝরে অস্টিন এসে গা ঘেঁষে থেমে গেল। দেখি না, মুরারি।

কিরে, কী ব্যাপার?

বলছি, জলদি উঠে আয়। দরজা খুলে ধরল ও। উঠে বসলাম।

কোথায় যাবি?

তোর পিণ্ডি চটকাতে যতক্ষণ অবধি চুপ থাকতে বলি, কথা কইবি না একটাও।

আরে শোন। আমি একটু যাচ্ছিলাম নিউ আলিপুরের দিকে কী বলবি বলে নে। তারপর না হয় নামিয়ে দিবি যেখানে হোক।

বলেছি চুপ করে থাকবি। আবার বকবক করছিস্! চোখ রাঙাল ও, তারপরে মিক্সচারের পাউচ আর রিজলা পেপার ছুঁড়ে দিল আমার গায়ের ওপর।

আমাকে তুলে নেবার পরেই গাড়ী ঘুরে চলেছে চৌরঙ্গীর দিকে। সিগারেট পাকিয়ে জ্বালিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

মুরারির এমন আচরণের সম্ভাব্য কারণ খুঁজেও হদিস করতে পারলাম না। কিছু কিছু খামখেয়ালীপনা যে ওর একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু এমনটা যেন বেসুরে বাজছে কোথায়।

চৌরঙ্গী ছেড়ে এক আধটা গলি পার হয়ে কোন হোটেল-কাম রেস্তোরাঁর সামনে থামল গাড়ীটা। নামতে ইঙ্গিত করল আমাকেও। নিঃশব্দে ওর পিছু পিছু গিয়ে ঢুকলাম একটা কেবিনে। ফ্লাশডোরটা বন্ধ হতেই লক করে আমার মুখোমুখি বসল ও। চোখে চোখে চেয়ে কী যেন দেখল, তারপরে বিনা ভূমিকাতেই বলল: আমার সঙ্গে চিটিং-বাজী করলি তুই শেষ পর্যন্ত!

কী চিটিং-বাজী করলাম আবার?

এখন আর ব্লাফ দিয়ে লাভ কী বল? যা হবার তো হয়েই গেছে। তবে সাবধান করার জন্যে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এসেছি। কোন বন্ধুর জীবন বিপন্ন হতে পারে জানার পরেও চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। এখন বিশ্বাস করা না করা, আমার কথা শোনা না শোনা সবটাই তোর মর্জি। তবে হ্যাঁ, শুনলে ভাল করবি।

কী হয়েছে, খুলে বল্ না?

তুই জানতিস্, রিপোর্টারদের ঢুকতে দেবে না ওরা। তাই ফল্স দিয়ে এন্ট্রি নিয়েছিলি। এখন ওরা ব্যাপারটা আঁচ করেছে, তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে তোকে।

কেন?

জামাই-আদর করবে বলে। বিদ্রূপে বিকৃত হয়ে গেল ওর গলার স্বর। এত জেনেশুনেও যেন ন্যাকা সাজছিস্। রিপোর্ট-টিপোর্ট দিয়ে ফেলেছিস্ নাকি?

কেন?

যদি না দিয়ে থাকিস্, দিবি না, অবশ্য যদি বাঁচতে চাস্

না হয় মারবে আমাকে আর কী হবে? এ রিপোর্ট দিতেই হবে আমাকে।

বেশ দিও। তবে এখনো যদি না দিয়ে থাক আর দিতে পারবে না। তোমার তল্লাসে লোক বেরিয়ে পড়েছে। ধরে ফেলবে ঠিক। আর ধরলেই একেবারে ফিনিস্ করে দেবে সিওর।

এত খবর পেলি কোথা থেকে ?

আছে, খবর পাবার সোর্স আছে। তবে একটা উপায় করা যায়। রাজী আছিস্ ?

কী উপায় বল্ ?

একজনের কাছে নিয়ে যাব তোকে। বুঝতে পারছিস্ কার কাছে ?

ভব ঘোষালের কাছে ?

উঁহুঃ—অত ওপরে নয়। ওর এক লেফ্‌টেন্যান্টের কাছে। তাকে রিপোর্টটা দিয়ে দিবি আর লিখে দিবি, ও সময়ে ঐ এলাকায় যাস্‌নি তুই।

ভাবার সময় দে একটু।

সময় দেবার মালিক নেই কেউ। ও লোককে চিনিস্ না তুই। ওকে দাঁড় করিয়ে দিল বলতে গেলে ডালুদা, আর তাকেই কিনা লটঘট বাঁধিয়ে, খতম পার্টির ছেলেদের উস্কে খুন করিয়ে দিল। অপরাধ কী ? না ডালুদা কথায় কথায় ডাটত ওকে, নানা কারণে একে-ওকে-তাকে ক্যাশ ছাড়তে হুকুম করত। এর মেয়ের বিয়ের টাকা নেই যাও ঘোষালের কাছে। ওর চিকিৎসা হচ্ছে না দাও ডাক্তার-খরচ, ওষুধ-পথ্যির দামকড়ি। আরও কত কী! ডালুকে ও আর সহ্য করতে পারছিল না মনে মনে। ব্যাপারটা বুঝেছি।

আশ্চর্য! তাই খুন করিয়ে দিল ?

তা দেবে না তো কী ? কতদিন আর ঐসব আব্দার মেটাবে ? কাজেই কেমন চীজ বুঝতে পেরেছিস্ তো ? অদ্ভুত ক্ষমতা ওর, ধারণা করতে পারবি না। আর বুদ্ধি ? বহর কত সে পরিচয় তো পেয়েই গেছিস্। তোর সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করেছে, ঠিক

খবর পেয়ে গেছে বোধহয় এতক্ষণে। আর না পেয়ে থাকলেও পেতে দেরী হবে না। তাই তোর ভালোর জন্যেই বলছি।

এত সব জানাতে ছুটে যে চলে এসেছিস্ সেজন্যে তোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তবে কি জানিস, আমি ভাবছি, ফেস করব যদি কেউ আসে।

ফেস করবি মানে? জেনেশুনেও খুন হবি?

আহা—ওরা তো খুন নাও করতে পারে। হয়তো রিপোর্ট দিতে মানা করবে, শাসাবে। আর সত্যি সত্যি রিপোর্টটা তো দিইনি কারো কাছে। ওরা যদি চায় দিয়ে দেব।

তাতেই কি শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা! পরে আবার রিপোর্ট লিখে তুই আর কাউকে দিতে পারিস তো! কাজেই আমার মনে হচ্ছে, তোকে ফিনিস করতেই আসবে ওরা। এসকেপের পথ, দেশ ছেড়ে পালানো। নইলে আগে যা বলেছি তাই কর। তুই বরং পালা। চলে যা কোথাও।

দেখি এখন কী করতে পারি, চল্।

উঠেই পড়লাম। কেমন যেন অসহ্য লাগছিল কেবিনটা।

বেশ। এক লম্বা নিশ্বাস টানল মুরারি, তারপরে আবার বলল: নেহাৎ তপু জোর করে পাঠাল এসব শোনার পরে তোকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে, তাই এত কিচাইন করছি। নইলে তোকে এমন জ্বালাতে আসত কোন শালা।

হয়ত আমার উচিত ছিল তপতীর এইটুকু ভাবনার জন্যে মুরারির মারফৎ ওকে কৃতজ্ঞতা জানানো বা ধন্যবাদ দেওয়া। কিন্তু পারলাম না। উঠে ক্লাশডোরের লকটা খুলে বেরিয়ে পড়লাম। পিছু পিছু মুরারি এল। ওর হাবভাবে রাগ আর ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিল। পেছন থেকেই অনুভব করছিলাম সেটুকু।

এসে গাড়ীতে বসতেই গভীর অতলে ডুবে গেলাম। জিজ্ঞাসা করল মুরারি, কোথায় যাবি বলছিলি যেন? নামিয়ে দেব কোনখানে?

বাড়ী ফিরব। নিয়ে চল্ ফিরিয়ে। আর কোথাও যাব না।

সারাটা পথ আর কোন কথা কইনি দু'জনে। মুরারিকে মনে হচ্ছিল, যেন একটু আশ্বস্ত। বোধহয় বাড়ী ফিরব বলেছি, এইজন্যে।

গাড়ীটা থেমে যেতে আপনা থেকেই সম্বিত এল। নেমে পড়ে মুরারির সঙ্গে চোখোচোখি করেই বিদায় জানালাম। ওকে বাড়ীতে ডেকে বন্ধুত্বের সৌজন্য দেখানোর কথা মনে পড়ল না আমার।

বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে ভাবনার স্রোতটা ধরা পড়ল। কী ভাবছিলাম এতক্ষণ? মুরারির সঙ্গে সেই রেস্তোরাঁর কেবিন থেকে বেরিয়ে অবধি কোন অবচেতন চিন্তার জাল পাকে পাকে বেঁধে ফেলেছে আমাকে অক্টোপাসের মত।

ঘরে এসে ফের লিখতে বসলাম।

আবিষ্কার করেছি, মৃত্যুর আশঙ্কাই জড়িয়ে ফেলার জাল বুনেছে। স্বচ্ছন্দে কোন অবসরে তাকে সর্বাঙ্গে আত্মস্থ করেছি। এর থেকে রেহাই নেই। মানুষ জেনেশুনে যখন কোন আশঙ্কার শিকার হয় তখন তার পরিত্রাণের পথ মেলে না। আমার বেলাতেও মিলবে না।

পালাব? শহর ছেড়ে কিংবা বাংলা ছেড়ে। তাতে হয়ত সাময়িক নিষ্কৃতি। কিন্তু যদি দলগত দ্বেষের শিকার হয়ে পড়ি সম্ভবতঃ আর কখনো এই দেশের মাটিতে বুক ভরে শ্বাস নিতে পারব না, প্রাণ খুলে বিশ্বাস রাখতে দ্বিধা হবে যে কারো ওপর। অবিশ্বাস আর আশঙ্কা উৎকণ্ঠা দেহমনের অণুপরমাণুতে মিলিয়ে-মিশিয়ে আর যেই বাঁচুক না কেন, মানুষ বাঁচে না। কোনমতে জীবনটাকে বজায় রাখার নামই টিঁকে থাকা বা বাঁচা নয়।

কোন অপরাধে অপরাধী ভাবতে পারি না যেখানে নিজেকে সেখানে কেন আশঙ্কা, কেন ভয়, কেন সংশয়? জীবন একদিন না একদিন যাবে বলেই যে মরতে প্রস্তুত, তাও নই আমি। আমি সেই

পরম ও চরম বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই, যে বিস্ময় অকারণ, যে বিস্ময়ের অপরিহার্য স্বাদ হল নিষ্ঠুর মৃত্যুর পরশ। এই পরশের ওপারে যদি ক্ষণিকের অবসাদ মেলে তাহলে হয়ত সভ্যতাকে জানাতে পারব আস্বাদিত বিস্ময় আর মৃত্যুর শীতলস্পর্শের কথা। মনে হয়, তাতে থাকবে এক দুর্বিসহ যন্ত্রনা। শারীরিক নয়, ছুরির ঘায়ে খণ্ড-বিখণ্ড হবার নিদারুণ বেদনা ততটা নয়—যতটা মস্তিষ্কের বিচারবুদ্ধির অন্ধকারে হাতড়ে মরার আক্ষেপের যন্ত্রণা। এ কোন নিঠুর দেবতা, যার যূপকাষ্ঠে এত শোণিত মদিরার রূপে উচ্ছল হয়? কী তার নাম?

কোন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ডাকাডাকিতে উঠে গেলাম। টেলিফোন ধরবার জন্যেই নামতে হল নীচের ফ্ল্যাটে।

নামতে নামতে অনুভব করলাম, কেমন একধরনের অস্বাভাবিকতা সারা দেহমনকে গ্রাস করে রয়েছে। গত দিনের ভাবনা তার জের রেখেছে প্রবলভাবে। ঠিক হ্যাঙ্গ-ওভার বলব না একে, কী বলব জানি না। তবে রগের শিরা দুটো দপদপ করছিল।

ফোনটা ধরতেই কেমন যেন অসাড় হয়ে গেলাম। এটাই তো আমার প্রত্যাশিত হওয়া উচিত ছিল। কাজ শেষ। যার কাজ তার কাছে বুঝসমুঝের ব্যাপারটা তো স্বাভাবিক, অত্যন্ত সঙ্গত।

কিন্তু সাম ওয়েনের গলাটা অমন কেন? বেশ বিচলিত। ও কি তাহলে কোন খবর পেয়েছে কোন এক দল আমার জন্যে কোথাও ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে? ওর আলাপ সুরু: গাড়ী পাঠাচ্ছি এক্ষুনি, চলে এস।

কোথায়? নিরুত্তাপ গলায় জানতে চাইলাম।

গাড়ী ঠিক জায়গাতেই নিয়ে আসবে তোমায়, ভয় নেই।

তবুও, কোন্ জায়গায়?

এলেই দেখতে পাবে। দ্বিধা করো না, চলে এসো এক্ষুনি।

কিন্তু রিপোর্টটা কমপ্লিট হয়নি। বিকেলে না হয়—

না, না, বিকেল নয়। যেন চমকে উঠল সাম। নোট রেখেছ তো? তাতেই হবে। আমাকে এক্ষুনি মেসেজ পাঠাতে হবে, তাগাদা এসেছে। আর ডকুমেণ্টারী নিয়েছ তো?

নিয়েছি। কিন্তু বিকেলে দিলে কি ক্ষতি হচ্ছে?

হচ্ছে, খুব ক্ষতি হবে। চলে এসো এখুনি, যা যেমন অবস্থায় আছে নিয়েই গাড়ীতে উঠে পড়বে।

কিন্তু—

ওঃ! যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সামের। প্লীজ ডু হোয়াট আই সে। ও. কে।

আর কোন কথা বলার সুযোগই দিল না আমায়।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে এলোমেলো পদক্ষেপে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। সমস্ত ব্যাপারটার ছবি স্পষ্ট করে দেখতে চাইলাম একান্তে।

খুব পরিষ্কার চিত্র। আমাকে ডেকে এ কাজের ভার দেওয়া থেকে সুরু করে এখনকার এই টেলিফোনের পেছনে সেই সূত্রটি পরিকার যার চিন্তা প্রথমেই চেতনায় উঁকি দিয়ে গিয়েছিল। সুচিরার লাস্যনদির কথাবার্তার অন্তরালে সেই সূত্র। কী লোভ—অর্থের, যশের, প্রতিপত্তির যা বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতে রেখেছে। আর সেই ফাঁদে নিতান্ত নিবোধের মত ধরা দিয়েছি।

দুটি পথ—মুরারি যাদের কথা বলে গেল, তাদের হাতে সব সঁপে দেওয়া এবং প্রাণটুকু রক্ষা করা, নইলে সাম ওয়েনের মারফৎ বিশ্বরাজনীতির কোন রাঘববোয়াল গুপ্তচক্রের হাতে চব্বিশ ঘণ্টা জীবনমৃত্যুর দোলায় দুলতে দুলতে সংগ্রহ করা সাধের ফসল তুলে দিয়ে 'বিশ্বাস' রাখা। এটুকু নিশ্চিত, সংবাদ হিসেবে তা কোনদিনই বিশ্বের মানুষের দরবারে পৌঁছবে না।

সুচিরা বিশ্বাস করতে বলেছিল তাকে। ওর তখনকার চোখের দৃষ্টিতে তো ছিল সমর্পণের আকুতি, নিবেদনের অর্ঘ্য। যা পড়েছিলাম

তাতে, সে কি ভুল? ওর সেদিনকার ব্যবহার সত্যি কি 'শো'? বিশ্বাস? বিশ্বাস! মাথার মধ্যে ক'টা শব্দতরঙ্গ পাক খেতে লাগল।

বিশ্বাস! সাম ওয়েনও বিশ্বাস করে কাজ দিয়েছে আমাকে, মুরাবি, ছোটবেলাকার বন্ধু। সেও বিশ্বাস করেছিল আমায়। সে বিশ্বাস নিয়ে কে কোথায় নামলাম? হাসি পেল। কে কোন যুগে কী অহমিকায় যে বিচিত্র এক দায়ের এমন অদরকারী নামকরণ করেছিল কে জানে?

সুতরাং এ কোন দুনিয়া, যাতে বাঁচতে হবে? এ কোন পৃথিবী, যার জলবায়ু টিকিয়ে রেখে দেবে প্রাণ? এ কোন নরনারীর জগৎ, যাদের কারো জন্যে কারো অনুভূতি সাচ্চা নয়, যাদের প্রত্যেকের মনটা কোন না কোন মতলবের পাকচক্রে নিরন্তর ঘোরে?

কাউকে মন খুলে বলতে পারব না, কারো কাছে কোন কথা শুনে অবাক হতে পারব না। সত্যিকার যা প্রাণে বাজছে কোনদিন তা প্রকাশ করতে পারব না। এইজন্যেই কি আকাশ থেকে নেমে এসেছিল আলো? কোটি কোটি যুগের গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে বসুন্ধরা জন্ম দিয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষকে? আর সভ্যতার সেই আদি পিতামাতা যাঁরা অজস্র ত্যাগে কাল থেকে কাল ধরে সভ্যতার বাস্তরূপ গড়ে গেছেন, তাদের আবির্ভাব কি এই জন্যে হয়েছিল?

আমি তো চেঁচিয়ে বলতে চেয়েছি, তোমরা সবাই দেশের ভালো করতে চাও। তবে কেন এই বীভৎসতা? কেন এই নিরন্তর হানাহানি? সমাজের যেখানে পাপ, যেখানে অনাচার, বহু বঞ্চনার উৎস, সেখানে তো তোমরা কেউ অস্ত্র ধর না? যাদের কিছু নেই শুধু শুকনো পাতার মত খড়খড়ে ভঙ্গুর জীবন ছাড়া, তাদের রক্তে কেন তোমাদের পিপাসা মেটাও? এ অকারণ অপচয়ের কৈফিয়ৎ যখন মহাকাল চাইবে তখন কোন্ উত্তর তোমরা দেবে? বলবে কি আমরা নরম মাটিতেই কারিগরির ওস্তাদ?

কিন্তু কোথায় কার কাছে বলব, শুনবে কে? একটা নিরুপায় উত্তেজনা প্রায় পাগল করে তুলল আমায়।

হঠাৎ জানলা দিয়ে চোখ গেল নীচের রাস্তায়। আমাদেব ফ্ল্যাটবাড়ীর গলিপথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো এ্যামবাসাডর। পরিচিত ক্যানবেরা-১২ গাড়ীটা ঢুকতে চাইছে গলির মধ্যে কিন্তু পথ আটকে আছে এ্যামবাসাডরটা। চেহারা দেখলেই পরিচয় বোঝা যায় এমন জনাচারেক পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ীটার সামনেই। ওদের ভঙ্গি শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ওৎ পেতে থাকার মত।

মুহূর্তেই আমার মনে হল, কোন মানে হয় না এমন কোন-মতে টিঁকে থাকা জীবনের। যে জীবনের মণিকোঠায় অনেক মূল্যে অনেক শ্রমে ফসল তুলেছি কিন্তু তা কোনদিনই কারো কাজে আসবে না, তার না থাকাই ভালো! শুধু যদি একবার বলে যেতে পারতাম—

পোশাক বদলে নিলাম অচঞ্চলভাবে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কে যেন আমায় নাড়া দিল। অন্তর্যামীকে বললাম, প্রভু আমার শতকোটি অপরাধ তুমি ক্ষমা করো। কিন্তু আমার উপলব্ধি যেন না হারায়। আমাকে শেষ করে দাও। তার বদলে একটি ভিক্ষা, মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে এমনতরো বীভৎসতার কৈফিয়ৎ যেন কোন উত্তরপুরুষ চায় একদিন না একদিন।

অন্তর্যামী শুনলেন কিনা জানি না। কিন্তু আর দেরী না করে ডায়েরীর ছেড়া পাতাগুলো আর মাইক্রো-ক্যামেরাটা নিয়ে নেমে চললাম। নীচে গিয়ে ঐ গাড়ীদুটোর কাছাকাছি হবার পরে কী হবে দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। সেই অকারণ বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে আর তার পরের স্বাদটুকু পাবার টানে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরোচ্ছি শরীরটাকে টান টান করে।
